

অন্তিম চিঠি



মুনীরুল ইসলাম আয়-যাকির

সম্পাদক, মুসলিম বার্তা, ঢাকা।

হাজারী বাড়ি, পাঁচকাঠা বাজার

কলমাকান্দা, নেত্রকোণা।

E-mail: ibnujakir1@gmail.com

www.facebook.com/ibnujakir1

Web: ibnujakir.wordpress.com

Contact: +8801828616067

প্রকাশক:

পরকালের পাথেয় ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ

প্রকাশকাল:

প্রথম প্রকাশ: ৩১ মার্চ, ২০১৪।

পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ: ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫।

গ্রন্থস্বত্ব: প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত।

শুভেচ্ছা মূল্য: ২৪.৯৬ (চব্বিশ টাকা ছিয়ানব্বই পয়সা)

ONTIM CHITHI

Written by Munirul islam aj-jakir, Published by

Porokaler pathoyo foundation of Bangladesh.

Fixed price: 24.96 taka only.

সূচনালাপ

সকল প্রশংসা কেবল সে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালায় জন্য যিনি এ নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের সার্বভৌম ক্ষমতার একক অধিকারী। যিনি সৃষ্টি করেছেন অসংখ্য অগণিত মাখলুক। আর তন্মধ্য হতে শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে ঘোষণা করেছেন মানব জাতিকে। আর সে মানব জাতির জীবন চলার পথনির্দেশিকা তথা সংবিধান হিসেবে দিয়েছেন ঐশীগ্রন্থ।

সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক বিশ্বনাবী, রাহমাতুল্লিল আলামীন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি, যিনি রবের দেয়া সে ঐশী সংবিধানকে তাবলীগ, তানযীম, তারবিয়াত ও চূড়ান্তপর্ব কিতালের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এই ধরণীর বুকে। **অতঃপর-**

মানুষ রবের দেয়া সে ঐশী সংবিধানকে মৃতব্যক্তির দাফন শেষে বেচে যাওয়া কাফনের সাদা কাপড়ে মুড়িয়ে সযত্নে রেখে দিয়েছে ঘরের পরিত্যক্ত এক কোণে; মৃত এক টুকরো কাঠের ‘পরে। আর জীবন পরিচালনার জন্য বেছে নিয়েছে তাগুতী সব তন্ত্র-মন্ত্র-ইজম। ফলে মানবজীবনের কুসুমবাগে আজ জ্বলছে কেবল অশান্তির দাবানল। বিশেষত: যুবসমাজকে যেখানে বলা হয়ে থাকে একটি জাতির প্রাণশক্তি, সে যুব সমাজের আজ কী করণাবস্থা তা সুস্থ মস্তিষ্কধারী প্রত্যেকেরই জানা। পার্ক-পতিতালয় আর তথাকথিত কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঝে পার্থক্য খুঁজতে গিয়ে ব্যর্থ হতে হয় আমার মতো অল্প বিদ্যাসম্পন্ন মানুষগুলোকে। অশ্লীলতার চোরাশ্রোতে আজ হারিয়ে গেছে মুসলিম যুবক-যুবতীর তাওহীদী চেতনা। পৃথিবী নামক বাগান হতে না ফুটার আগেই ঝরে যায় অগণিত রক্তিম গোলাপ। অথচ এরাইতো জাতির আগামী দিনের কান্ডারী। তাই এভাবে মিথ্যার চোরাশ্রোতে ভেসে যেতে দেয়া যায় না তাদের। রুখে আজ দাঁড়াতেই হবে এই স্রোত। আর তাইতো তাওহীদী খেয়ায়ানে কুরআন নামক বৈঠা আর হাদীস নামক পাল উড়িয়ে শত সিন্দাবাদ আজ তাদের আহ্বান জানাচ্ছে জীবনের প্রকৃত সুখদ কাননে। আমি অধমও একেবারে পিছনের সারির হলেও তাঁদেরই একজন।

কী এবং কেন এই ‘অন্তিম চিঠি’

২০১৩’র জানুয়ারি মাসের কোন এক পড়ন্ত বিকেল। ফেনী থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক ‘মুক্ত কলম’ এর সার্কুলেশন ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করতাম তখন। অফিসেই বসে আড্ডা মারছিলাম সহকর্মীদের সাথে। হঠাৎ সেলফোনটা বেজে ওঠে। হাতে নিয়ে দেখি স্নেহের ছোট ভাই রাকিবের কল। অফিসে আছি কিনা জিজ্ঞেস করে রাকিব। হ্যাঁ বাচক জবাব দিই আমি। মিনিট দশেকের মধ্যেই অফিসে এসে উপস্থিত হয় সে। প্রথমেই হাতে তোলে দেয় একটা চিঠি। চা খেতে খেতে একটানেই পড়ে ফেলি চিঠিটা। হ্যাঁ, সেটিই মুদ্রিত অক্ষরে রঙিন মলাটে আবৃত আজকের ‘অন্তিম চিঠি’।

যাতে রয়েছে অশ্লীলতার চিতায় দন্ধ এক তরুণীর যবানবন্দী। না ফুটার আগেই ঝরে যাওয়া এক রক্তিম গোলাপের স্বহস্তে লিখিত ঝরে পড়ার করুণ বর্ণনা ও দ্বিতীয় পর্বে আমার সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ। রয়েছে ভবিষ্যৎ-কর্ণধারদের প্রতি তাওহীদী খেয়ায়ানে আরোহণের উদাত্ত আহ্বান। দিগভ্রান্ত নাবিকের জন্য রয়েছে মহা-মুক্তির পয়গাম। অশ্লীলতার কর্দমায় সিক্ত যুবক-যুবতীর জন্য রয়েছে স্বচ্ছ বর্ণাধারা। রয়েছে হেরার আলোকোজ্জ্বল এক দৃষ্টিমান জীবনপ্রদীপ। তাই জীবনযুদ্ধে আর হেরে যাওয়া নয়; নয় আর ঝরে যাওয়া না ফুটার আগেই। এসো! এসো হে বন্ধু মরেও যেভাবে চির অমর হওয়া যায় তোমায় সে অমিয় সুধার সন্ধান দিই। যে অমিয় সুধাপানে এ জীবনে পাবে পরমানন্দ আর পরজীবনে তুমি হবে ভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত।

মুদ্রিত অক্ষরে আর মনকাড়া মলাটে আবৃত যে অন্তিম চিঠি দেখছো, এর পেছনে রয়েছে অনেকের শ্রম-মেধা অথবা আর্থিক সহযোগিতা। কারো নাম উল্লেখ করে মৌখিক ধন্যবাদ দিয়ে তাদের অবদানকে আমি ছোট করতে চাই না। শুধু বলি, শেষরাতের অশ্রুবিগলিত মুনাজাতে স্বরণে রেখ নাম না জানা এসকল তাওহীদী নাবিকদের। সাথে রেখ আমি অধমকেও।

ইতি—

মুনীরুল ইসলাম ভাষা-যাকির

৩১/১২/২০১৩

মুসলিম বার্তা কার্যালয়, ঢাকা।

অন্তিম চিঠি

অনাবিল সুখে সমৃদ্ধ ছিল আমাদের ছোট পরিবারটি। যেন তিন সদস্যের এক ভিন্ন গ্রহ। আব্বু-আম্মু আর আমি। যেন দুটি পাখির একটি ছানা। তাদের স্নেহের ডানাধ্ব্য সর্বদা আমার উপর ছিল কঠিন ইম্পাতের ন্যায়। একমাত্র আমিই তাদের আশা-ভবিষ্যৎ। দাদা-দাদী, নানা-নানী, আত্মীয়-স্বজন কারো আদর-সোহাগ, স্নেহ-মায়া, মমতা থেকে কখনো এক চিলতও বঞ্চিত হয়েছি বলতে পারব না। সব মিলিয়ে জীবনের গতি হয়ে উঠেছিল ছন্দময়। গতিময় ছন্দের মোহনীয় ব্যঞ্জনায় সত্যিই বিমোহিত ছিল আমার জীবন। আমার ভূবনটাই ভিন্নরকম। সব পেয়েছিলাম আমি। যেন এক সম্পূর্ণ রাজকন্যা। অথবা তারচেয়েও বেশি কিছু।

কিন্তু এত সুখ কপালে সয়নি আমার। এসবের বাইরেও আমার মন আরও কিছু পেতে চায়। পারিবারিক চৌহদ্দিতে যে চাওয়ার কোন মূল্য নেই। তাই এতসব পেয়েও না পাওয়ার একটা করুণ সুর অবিরত বাজতে থাকে আমার হৃদয় ভূবনে। বেদনায় নীল হয়ে যায় আমার মন।

বার্ষিক পরীক্ষার দীর্ঘ ছুটি। আব্বুরও অফিস বন্ধ। তাই সিদ্ধান্ত হলো স্বপরিবারে গ্রামের বাড়ি যাওয়ার। সকালের নাস্তা সেরেই রওয়ানা হলাম গ্রামের বাড়ি পরশুরাম থানাধীন বক্স মাহমুদের উদ্দেশ্যে। মেইন রোডের পার্শ্বেই অনেকদিনের পুরনো একটি বিশাল পুকুরের পশ্চিম পাড়ে ছোট ছোট তিনটি ঘর নিয়েই সটান দাড়িয়ে আছে বাড়িটি। পুকুরের চার পাড়েই আছে রকমারি ফলজ, বনজ ও ভেষজ গাছ-গাছালি। মাঝে মাঝে দু’ একটা খেজুর ও তাল গাছ যেন পরিবেশটাকে আরও মোহনীয় করে তোলে। বাড়িতে দাদা-দাদী ও ছোট কাকা থাকেন পরিবারসহ। বাড়ি পৌঁছাতে দুপুর প্রায় বারটা গড়ায়। অতঃপর ফ্রেশ হয়ে লাঞ্চ সেরে নিই। বিকালে বের হই একটু পুকুর পাড়টা হাঁটতে। হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে পূর্ব পাড়ে অবস্থিত পুরাতন ঘাটলাটার উপর বসি। দক্ষিণপূর্ব কোণে অবস্থিত বড় তাল গাছটার দিকে আনমনা দৃষ্টিতে তাকিয়ে অবলোকন করছিলাম বাবুই পাখিগুলোর জীবনের গতি-প্রকৃতি। আর ভাবছিলাম অনেক কিছুই।

হঠাৎ “স্বামালাইকুম! (আসসালামু আলাইকুম-এর বিকৃত রূপ) বসতে পারি?” এমন একটা আবেদনময়ী মৃদু শব্দে সম্মিৎ ফিরে পেয়ে চোখ নামাতেই দেখি সূঠামদেহী এক সুদর্শন জোয়ান দাঁড়িয়ে। “বসুন!” বলে বাম দিকের সিঁড়িটার দিকে ইঙ্গিত করি। দু’জনই দু’জনার নাম-পরিচয় জেনে নিই। সন্ধ্যা পর্যন্ত কথা চলে। মাগরিবের আযান হলে চলে যেতে উদ্যত হয় সে। জানতে চায় মোবাইল ব্যবহার করি কিনা। “না” বাচক জবাব দিয়ে আমিও পা বাড়াই বাড়ির পানে। “আরিফ খান, নাট্য অভিনেতা ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব। প্রশিক্ষক, রবীন্দ্র সংগীতালয়। সহ-সম্পাদক...” মনকাড়া ডিজাইনের একটা রঙিন ভিজিটিং কার্ড আমার হাতে তোলে দেয় সে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। ঝিঝি পৌকাগুলো স্বাগত জানাচ্ছে সন্ধ্যাকে। দু’জনই পা বাড়ালাম গন্তব্যের দিকে।

আব্বুর প্রতিশ্রুতি ছিল এস.এস.সিতে এ+ পেলে মোবাইল কিনে দেবে। যথাসময়ে রেজাল্ট বের হলো। আমিও ভাগ্যক্রমে পেয়ে গেলাম এ+! খানিক পরেই আব্বু বাসায় আসলেন, সাথে মিষ্টির প্যাকেট আর হাই কোয়ালিটির একটা মোবাইল সেট। আনন্দেতো আমার আর তর সইছে না। প্রথমেই কল দিই আরিফকে। রেজাল্ট জানাই তাকে। প্রথমে আরিফ খুব রাগ করে এ জন্যে যে, সে অনেকবার আমাকে একটা মোবাইল কিনে দেয়ার কথা বলেছিল, কিন্তু আমি সেটা গ্রহণ করিনি। আমি তাকে বুঝানোর চেষ্টা করি, তার কাছ থেকে মোবাইলটা নিলে পরে কী কী প্রশ্নের সম্মুখীন আমাকে হতে হতো। ততক্ষণে আশপাশের ফ্ল্যাটের সমস্ত আন্টিরা জড়ো হয়ে গেছেন আমাদের বাসায়। আম্মু সবাইকে মিষ্টিমুখ করান। সবাই আমার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করে দুয়া করেন। এভাবেই কেটে যায় সারাটা দিন। আমি প্রস্তুতি নিতে থাকি কলেজে ভর্তির।

পহেলা বৈশাখ। আমার জীবন গগণে যে দিন উদ্ভিত হয় সুখের এক নতুন দিগন্ত। মুছে যায় হৃদয়াকাশের বিষাদমাখা নীল মেঘগুলো। খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে ফ্রেশ হয়ে প্রতিদিনকার রুটিন অনুযায়ী বই-খাতাগুলো খুলে একটু পড়তে বসি। ঠিক পড়তে বসেছি বললে বোধহয়

অন্যায় হবে; কারণ বসে বসে এসএমএস করছিলাম আরিফকে। ইংরেজিতে লেখা বাংলা এসএমএস- Arif, jibon ki jinish ta tumi amay shikhiyecho. Shikhiyecho jibonke kibhabe enjoy korte hoy... ইত্যাদি। দ্রুত রেডি হয়ে অপেক্ষা করতে থাকি আরিফের জন্য। সে এসএমএস দিয়ে জানায়, Jan, ami trungk road sohid minar chottore tomar jonno opekkha korchhi. tumi taratari chole esho...। এমন সময় আম্মু বুঝে প্রবেশ করে জিজ্ঞেস করেন, তানিয়া, কোথাও যাচ্ছিস নাকি? হ্যাঁ আম্মু, একটু আঁখিদের বাসায় যাচ্ছি বলে ব্যানিটি ব্যাগটি কাঁধে ঝুলিয়ে খুব দ্রুত বেরিয়ে পড়ি। একটা রিক্সা নিয়ে চলে যাই ট্রাংক রোড শহিদ মিনার চত্বর। প্রথমেই পাস্তা-ইলিশ পর্ব সেরে সোজা চলে যাই মহিপাল দিঘীরপাড়। পশ্চিম উত্তর কোণের একটা গাছের নিচে বসে পড়ি দু’জন। আমার কোমল দেহটা এলিয়ে দিই আরিফের কোলে। অনুভব করি এক রাজ্যের প্রশান্তি। একে অপরের কাছে ব্যক্ত করি হৃদয়ের যত আশা-আকাঙ্ক্ষা। এভাবেই কখন যে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে তা টেরই পায়নি। আরিফ মোটর বাইকে করে আমায় বাসায় পৌঁছে দিয়ে সে তার বাসার দিকে চলে যায়। আমি অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকি তার চলে যাওয়ার পথটি পানে।

কথা-বার্তা, দেখা-সাক্ষাত আর ছোটখাটো দু’একটা ঘটনার মধ্যে দিয়ে এভাবেই এগিয়ে চলে আমাদের সম্পর্ক। অপরদিকে আম্মু-আব্বুর মাঝে লক্ষ্য করি বিরাট এক পরিবর্তন। দু’জনই নিয়মিত নামায পড়েন, রোযা রাখেন, সবসময় কুরআন-হাদীস পড়েন ইত্যাদি। মুখে ইয়া লম্বা লম্বা দাড়ি রেখে আব্বু তো পাক্ষা মৌলভী সেজে বসেছেন। আর আম্মুর কথা কী বলব! আব্বু বড় মামার কাছ থেকে কিছু বই নিয়ে এসেছেন; আম্মু সারাদিন ওগুলো নিয়েই পড়ে থাকেন। পাশের ফ্ল্যাটের আন্টিদের নিয়ে সারাক্ষণ বক বক করে চলে। বাইরে কোথাও বের হওয়ার সময় ভূতুড়ে একটা সাজ ধরেন। আবার আমাকেও ঐ ভূতুড়ে পোষাক (বোরকা) পড়ার তালিম দেন। অনেক বই-পুস্তক আমাকে পড়তে দেন। আমি ওগুলো সুন্দর করে ওয়াড্রবে রেখে দিই। ইদানীং আমি কোথায় যাচ্ছি, কী

করছি, কখন ফিরছি আম্মু সব লক্ষ্য রাখেন। তারা দিন দিন আমার প্রতি কঠোর হোন; আমিও তদ্রূপ আমার উগ্রতার মাত্রা বাড়িয়ে দিই।

আম্মু-আব্বুর এই পরিবর্তনের মূলে আছেন আমার বড় মামা। মুখে ইয়া বড় বড় দাড়ি, বাবড়ি চুল, ঠিক যেন আদিম যুগের মানুষ। কথা-বার্তা শুনলে মনে হয় পুরা জঙ্গি। উনিই নষ্ট করেছেন দু'টি সুস্থ্য মাথা। প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন আরও হাজারও মাথা নষ্টের। কী লাভ জানি না এসব করে। মানুষ যার যা ইচ্ছে করুক। এখানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে কী লাভ? উনার ওসব হাবিজাবি বই পড়ে পাশের ফ্ল্যাটের আন্টিদেরও মাথা গেছে!

অপরদিকে আরিফ আর আমার সম্পর্কের দৃঢ়তা ক্রমশ বাড়তেই থাকে। পরিবারের চোখে আমি হয়ে উঠি পরিপূর্ণ উগ্র। তাই তারা সিদ্ধান্ত নেন আমার কলেজে যাওয়া বন্ধ। মানে পড়া-লেখাটা আর হচ্ছে না। আরও সহজে বলতে গেলে, আমি অবরুদ্ধ! এরই মাঝে দরজায় করাঘাত করে ফাইনাল পরীক্ষা। টেনেটুনে কোন রকম পরীক্ষাটা দিই। তবুও রেজাল্ট একেবারে খারাপ হয়নি। এদিকে আরিফ আর আমার সম্পর্ক পদার্পণ করল তৃতীয় বর্ষে। আরিফ-তানিয়া। যেন দু'টি প্রবহমান স্রোতধারার একটি মোহনা। যেখানে মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেছে দু'জনার সব চাওয়া-পাওয়া। তাই আরিফের সাথে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপনেও বাঁধ সাধেনি বিবেকে। স্ব-ইচ্ছায়ই বারংবার আবদ্ধ হয়েছি আরিফের বাহবন্ধনে। কুঠাবোধ করিনি একই বেড়ে রাত যাপনে!

ফ্যামিলির সবাই হন্যে হয়ে আমার জন্য বর খোঁজে চলেছেন। আমিও ভাবি, এই সুযোগে আরিফের সাথে বিয়ের ব্যাপারটা সেরে ফেলব। কিন্তু ব্যত্যয় ঘটে এখানেই। আরিফ স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, মাস্টার্স কমপ্লিটের আগে সে কোন ক্রমেই বিয়ে করবে না। তবুও বর খোঁজাখুঁজিতে কেটে যায় আমার জীবনের অবরুদ্ধ আরও একটি বসন্ত। অন্যদিকে আরিফও যেন দিন দিন একটু অন্য রকম হয়ে ওঠে। আগের মতো কল দেয় না, খোঁজ-খবর নেয়না, এসএমএস পাঠালে উত্তর দেয় না, কল দিলে খুব ব্যস্ততা দেখায় ইত্যাদি।

আজ সকাল সাতটা। ফেসবুকে চ্যাটিং চলছিল ফ্রেন্ডদের সাথে। হঠাৎ পাশের ফ্ল্যাটের মীম প্রবেশ করে আমার রুমে। দরজাটা আটকে দিয়ে একটা হিন্দি গান ধরে। আর তার তালে তালে তা-ধিন তা-ধিন শুরু করে দেয়। বিকট একটা ধমক দিয়ে থামিয়ে দিই ফাজিলটাকে। শুরু হয়ে যায় তর্কযুদ্ধ-

-কী ব্যাপার! ঘোড়ার মতো লাফাচ্ছিস কেন?

-লাফাব না কী করব, নতুন দুলাভাই আসছে আজ, খুশিতে যে আমার আর তর সইছে না। বলে আবার নাচতে শুরু করল মীম।

-অসহ্য! আগে ব্যাপার কী খুলে বলবি তো?

-ইশ! ভাবখানা এমন যেন নাবালগ শিশু!

-দেখ, আমি সিরিয়াসলি বলছি। কিছু একটা ঘটতে চলেছে বুঝতে পারছি। কিন্তু কী?

-কেন, আজ রাতে তোর বিয়ে। জেনেও আমার সাথে কেন ইয়ার্কি করছিস?

-আমার বিয়ে? আজ রাতে? অথচ আমি জানিনা! কী আবোল-তাবোল বকছিস?

-আরে তুই জানবি কী করে? তুইতো সারাদিন আছিস শুধু আরিফ আর আরিফ নিয়ে। শুনলাম, তোর মামার সাথে আব্দুল্লাহ নামের যে ছেলেটা মাঝে মধ্যে আসতো ওর সাথেই নাকি তোর বিয়ে। দেখতে কিন্তু তোর আরিফের চেয়ে কোনদিক দিয়ে...

-স্টুপিড! হয়েছে, হয়েছে। এতোই যদি পছন্দ করে ফেলেছিস, তবে তুই করছিস না কেন? তুই-ই করে ফেল।

-অসুবিধে ছিল না। কিন্তু সিরিয়ালটাতো তোর আগে, তাইনা?

-ঠিক আছে, এখন যা। আমার মেজাঘটা আর খারাপ করিস না।

-এজন্যই মানুষকে ভাল কিছু বলতে নেই...। বলতে বলতে চলে যায় মীম।

মাথাটা চরকির মতো ঘুরছে। ভেবে কোনক্রমেই কুলে ভিড়তে পারছি না। আরিফকে কল দিয়ে ব্যাপারটা জানাই। আরিফ বলে, ‘ঠিক আছে, আমি যে বুদ্ধিটা দিচ্ছি সে অনুযায়ী কাজ করলে কোন অসুবিধা হবে না। বুদ্ধিটা শোন.....

বিকাল তিনটা বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিট। এখনো মানুষের সমাগম তেমন ঘটেনি। সেই সকাল থেকেই পাশে আছে মীম আর আঁখি। দু’জনেই আমার প্ল্যানটা বুঝিয়ে বললাম। দু’জনেই সহযোগিতার আশ্বাস দিলো। জানালা দিয়ে বাসার পিছনের গলিটাতে একটা সিএনজি দেখা যাচ্ছে। মীমকে পাঠিয়ে খবর নিলাম সিএনজিটা রামপুর যাবে কিনা। যাবে বলে জানালো। ওয়াদ্রব থেকে আম্মুর দেয়া কালো বোরকাটা পরে আম্মুর চোখে ধুলো ছিটিয়ে সিএনজিতে গিয়ে উঠে বসলাম। কল দিলাম আরিফকে। তার বাসায় আসতে বলে কলটা কেটে দিল। সিএনজিটা নিয়ে সোজা চলে গেলাম আরিফের বাসায়। রুমে ঢুকেতো একেবারে হতবিস্ময়! ছেঁড়া সিগারেটের বাস্ক, ভাঙ্গা কতগুলো সিগারেট আর পরিত্যক্ত কিছু কাপড়-চোপড় ছাড়া আর কিছুই নেই রুমে। এমন সময় মোবাইলের ম্যাসেজ টোনটা বেজে উঠে। ওপেন করতেই দেখি আরিফের নাম্বার থেকে—

Taniya, meye manush boka hoy jantam; but tomar moto eto boka hoy ta amar jana chilona. parle amay khoma kore dio. bye!

এসএমএসটা পড়ার পরক্ষণে মনে হয় যেন সাত আসমান ভেঙ্গে পড়ল আমার মাথায়। কিছুই আর বুঝতে বাকি রইল না আরিফের অভিনয়। ভেবে কুল পাই না— যার উপর সঁপেছিলাম আমার জীবন-যৌবন সব। মা-বাবার আদর স্নেহের স্বর্গীয় পরিবেশ ছেড়ে যার জন্য; শুধু যার জন্য আজ নেমে এসেছি রাস্তায় সে কিনা করল আমার সাথে এত বড় গান্ধারি! কী করব এখন আমি? এই পোড়ামুখ কী করে দেখাব সমাজে? আরিফকে কোন দোষে দোষী করতে চাইনা। সব দোষই ছিল আমার। তাই আমার

মতো দোষী মানুষ এই পৃথিবীতে বেঁচে থেকে পৃথিবীর সুন্দর পরিবেশটাকে দূষিত করার কোন প্রয়োজন নেই। তাই আমি চলে যাচ্ছি। চলে যাচ্ছি চিরদিনের তরে; না ফেরার দেশে। তবে একটা আবেদন করে যাচ্ছি আমার মতো দিগভ্রান্ত হাজারও তানিয়ার কাছে। “হে বোন! ভুল করেও কখনও পা বাড়িওনা কথিত প্রেম-ভালবাসার এই অনৈতিক পথে। কারণ রঙের প্রেম-ভালবাসার বিষাক্ত ছোবলে আক্রান্ত হয়ে যখন ছটফট করতে করতে নীল হয়ে যাবে তোমার হৃদয়; তখন কিন্তু আত্মহত্যার পথ ছাড়া তোমার সামনে অন্য কোন সিদ্ধান্তের দুয়ারই উন্মুক্ত থাকবে না।”

ইতি

হতভাগিনী তানিয়া

১২/১২/২০১২

(ঈষৎ পরিমার্জিত)

[পরদিন ভোরবেলা ফেনী শহরস্থ রামপুর এলাকার একটি পরিত্যক্ত বিল্ডিং থেকে পুলিশ তানিয়ার লাশ উদ্ধার করে। পোস্টমর্টেম শেষে ১৪-১২-২০১২ রোজ শুক্রবার গ্রামের বাড়িতে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয় তানিয়ার লাশ। -লেখক]

চলে গেল তানিয়া:

যা রেখে গেল যুগের তানিয়াদের উদ্দেশ্যে:-

হ্যাঁ, তানিয়া চলে গেলেও যুগের দিগভ্রান্ত হাজারও তানিয়াদের উদ্দেশ্যে রেখে গেছে অনেক কিছুই। চল সেগুলোই একটু ভেবে দেখি। খুঁজে দেখি কী কারণে না ফুটার আগেই ঝরে গেল পুষ্পকাননের তানিয়া নামক রক্তিম গোলাপটি। মা-বাবার আদর-স্নেহের অটুট বন্ধন ছিন্ন করে কেন তাকে পাড়ি জমাতে হলো না ফেরার দেশে। মা-বাবাইবা কেন হারালেন তাদের আদরের দুলালীকে।

ঘটনার প্রথম প্রান্তে দৃষ্টি নিবদ্ধ কর। কি দেখতে পাচ্ছ? ঈর্ষা জাগানিয়া সুখ? কিন্তু সে সুখের রাজ্যে কেন নেমে এল দুখের এক পশলা বৃষ্টি? কেন নেমে এল অপ্রাপ্তির বিষাদমাখা ঝড়? হয়তো বলবে, এটাই স্বাভাবিক, এটাই প্রকৃতির নিয়ম। বয়সের এই সীমানায় সবার উপর দিয়েই বয়ে যায় যৌবনের আকস্মিক এক ঝড়। আর সে ঝড়ে শক্ত হাতে জীবনের হাল ধরতে না পারলেই এলোমেলো হয়ে যায় জীবনের সব আয়োজন-উপলক্ষ্য। আর সে ঝড়েই হাল ধরতে পারেনি তানিয়া। জীবনযুদ্ধে হেরে যাওয়ার এটাই তার প্রথম কারণ।

বলতে পারো, এটাতো প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় বিধি, যা রুখার সাধ্য কারো নেই। আমি বলবো, জীবনযুদ্ধে বিজয়ী সৈনিকের খেতাব পেতে এ যৌবনঝড় তোমায় বুখতে হবে না। তবে করণীয় রয়েছে অনেক কিছুই। যেমন-

জীবন নামক তরীতে কুরআন নামক বৈঠা আর হাদীস নামক পাল উড়িয়ে শক্ত হাতে ধরতে হবে জীবনের হাল। যেন মিথ্যার চোরাশ্রোতে ভেসে না যায় জীবন তরী।

দ্বিতীয়ত: দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে তোমার আশপাশের হাজারও তানিয়ার জীবনপ্রবাহের দিকে। যারা কথিত প্রেম-ভালবাসার বিষাক্ত ছোবলে জীবনযুদ্ধে হেরে গিয়ে বরণ করে নিয়েছে অপমৃত্যুর কলঙ্কজনক মালা।

তারপর নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারবে, তোমার জীবনের মোড় তুমি কোনদিকে ঘুরাতে চাও। কীভাবে বাঁচতে চাও পৃথিবীর বুকে, বিজয়ী সৈনিকের বেশে? নাকি তানিয়াদের মতো আত্মদান করতে চাও অপমৃত্যুর বিষাক্ত স্বাদ?

আবার দৃষ্টি দাও চিঠিতে-

তানিয়ার জীবনের সে শূন্যতার বিষাদগুলো দূর হয়ে যায় কার আগমনে? সে মহান ব্যক্তিটি হলো আরিফ। আপাত:দৃষ্টিতে তানিয়ার কাছে এটাই মনে হয় যে, তার জীবনের অপ্রাপ্তির কালিমাগুলো আরিফের স্পর্শেই মোচন হয়ে যায়। অত:পর দৃষ্টি নিবদ্ধ কর আরিফ-তানিয়া নামক অবৈধ জুটির সম্পর্ক গভীরায়ণের দিকে। তাদের সম্পর্ক গভীরায়ণের নেপথ্য বস্তুটি কি? হ্যাঁ, একটি মোবাইল। তাইতো তানিয়া মোবাইল হাতে পেয়ে সর্বপ্রথম কল দেয় আরিফকে। কয়েক ছত্র পর তানিয়া লিখেছে-

প্রতিদিনকার রুটিন অনুযায়ী বই খাতাগুলো খুলে একটু পড়তে বসি। ঠিক পড়তে বসেছি বললে বোধ হয় অন্যায় হবে। কারণ বসে বসে এসএমএস করছিলাম আরিফকে। কী বুঝলে? এমন হাজারও তানিয়া তোমার আশপাশেই খুঁজে পাবে, যারা পড়ালেখার নামে মা-বাবার চোখে ধুলো ছিটিয়ে সারাক্ষণ আড্ডায় মত্ত থাকে তাদের কথিত ঐ বয়ফ্রেন্ডদের সাথে। আবেগের বশে বিবেককে করে তোলে অক্ষম। ভুলে যায় তার আগামীর কথা, ভবিষ্যতের কথা। ভুলে যায় ক্যারিয়ার গঠনের মিশন। তানিয়ার আত্মহত্যার পিছনে কিন্তু তার মোবাইলটার অবদান মোটেই কম ছিল না।

ঘটনার স্রোতপ্রবাহে আরও এগিয়ে যাও। কী দেখছ? ডাহা কিছু মিথ্যে কথা? হ্যাঁ, তানিয়া যাচ্ছিল আরিফের সাথে বৈশাখ উদ্‌যাপনে। অথচ, তার আশ্রয় যখন জিজ্ঞেস করে, *তানিয়া, কোথাও যাচ্ছিস নাকি?* সে উত্তর দেয়, *“হ্যাঁ আম্মু, একটু আঁখিদের বাসায় যাচ্ছি।”* কত বড় ডাহা মিথ্যা আর ফাঁকিবাজি দেখলেতো? এ মিথ্যা/ফাঁকিবাজিই নাকি কথিত প্রেম-ভালবাসার প্রাণশক্তি!

একটু ভাবো তো, যে অনৈতিক সম্পর্কের শুরুরই হয় কতগুলো মিথ্যা প্রলাপবাক্য দিয়ে (যেমন- রিকশাচালক অথবা ভবঘুরে [ভাদাইমা] বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ডের কাছে নিজের পরিচয় যাহির করে উচ্চ শিক্ষিত খান বাহাদুর হিসেবে)

অতঃপর মা-বাবার চোখে ধুলো ছিটিয়ে, অসংখ্য ছল-চাতুরির ভার সহ্য করে এগিয়ে চলে যে অযাচিত সম্পর্কটি, সে নড়বড়ে ভিতের উপর কীভাবে নির্মিত হবে ভালবাসার সুদৃঢ় প্রাচীর? কী করে সেই জুটি গড়বে ভালবাসার ইম্পাতকঠিন ইমারত? কী করে তারা খুঁজে পাবে স্বর্গীয় সুখের দাম্পত্য জীবন? না! তানিয়ার মতো হাজারও অবলার জীবন কেড়ে নেয়া ছাড়া আর কিছুই উপহার দিতে পারে না এ অনৈতিক প্রেম-ভালবাসা।

অতঃপর তানিয়া চলে যায় আরিফের সাথে বৈশাখ উদযাপনে। প্রথমেই সেরে নেয় পান্তা-ইলিশ পর্ব। এ পান্তা ইলিশ সম্পর্কেও আমার কিছু মন্তব্য রয়েছে। সূক্ষ্ম জ্ঞানে অনুধাবন করলে কথাগুলো অগ্রাহ্য করার কোন উপায় অবশিষ্ট থাকবে বলে মনে হচ্ছে না।

প্রথমত: গ্রাম বাংলায় দেখেছি, পহেলা বৈশাখের দিন পান্তা-ইলিশ না পেলেও গোশত-পোলাও অথবা ভাল কোন খাবার খায় এই বিশ্বাসে যে, বছরের প্রথমদিন ভাল খেতে পারলে সারা বছর ভাল খাওয়া যাবে। যা অসাড় কল্পনা বৈ কিছুই নয়। বাস্তবতার জগতে এসো। ভেবে দেখ, যারা উপরোক্ত বিশ্বাসে সেদিন গোশত-পোলাও খাচ্ছে, তারা কি আদৌ সারা বছর গোশত-পোলাও খেতে পারছে? উত্তর হবে নিশ্চয় “না”। এবার মুসলিম হিসেবে আমাদের জেনে নেওয়া কর্তব্য হবে, ইসলাম এ ব্যাপারে কী বলে। এ ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশনা হচ্ছে, এটি একটি কুফরী বিশ্বাস। যা স্পষ্টত:ই তাওহীদে রুবুবিয়াত ও তাওহীদে আসমাউস সিফাতের সাথে সাংঘর্ষিক। কেননা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন, *ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণশীল সকলের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহর।* (সূরা হুদ: আয়াত নং ৬)

তিনি কাকে, কীভাবে, কখন, কী খাওয়াবেন তা তিনিই ভাল জানেন। তাহলে বাঙালি সংস্কৃতির নামে বাংলাদেশি মুসলিমদের উপর চাপিয়ে দেয়া এই কুফরী এবং অযৌক্তিক ভ্রান্তবিশ্বাস আর কতকাল বয়ে বেড়াবে নির্বোধ এই জাতি?

দ্বিতীয়ত: পান্তা-ইলিশের এই কুসংস্কৃতিটা যুগের ভ্রষ্ট আরিফ-তানিয়াদের মাঝেই বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তাই এই পান্তা-ইলিশ খাওয়ার

লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম এক পান্তা-ইলিশ বিক্রেতাকে। তিনি বলেছিলেন, এর সুনির্দিষ্ট কোন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নেই। তবে অনেকেই এই বিশ্বাসে খায় অথবা খাওয়ায় যে, এই বছরটায় যেনো তাদের সম্পর্কে কোনরূপ ভাটা না পড়ে। আবার অনেকেই কেবল সিনিয়রদের অনুসরণ করে থাকে। অর্থাৎ প্রেমজগতে যারা সিনিয়র তারা তাদের গার্লফ্রেন্ডদের খাওয়াচ্ছে দেখে জুনিয়ররাও সেটার অনুসরণ করে থাকে। আর এই ধারাটাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে লক্ষণীয়...। উপরোক্ত কথাগুলো বিশ্লেষণ করতে অথবা যুক্তির নিরিখে পরখ করতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে মূলে, যেখান থেকে উৎপত্তি এই ভালবাসার। এটা অস্বীকারের কোন উপায় নেই যে, প্রেম-ভালবাসা, মায়ামমতা মহান রবের অমোঘ বিধান, এক উপামাহীন অপার নিয়ামত। অভিধান রচয়িতাগণ এর অর্থ করেছেন নিম্নরূপঃ প্রণয়যুক্ত হওয়া, অনুরাগী হওয়া, স্নেহ করা বা প্রীতিভাবাপন্ন হওয়া, শ্রদ্ধা করা, ভক্তি করা, আসক্ত বা আকৃষ্ট হওয়া, পছন্দ করা ইত্যাদি।

চোখ তোল, ক্ষীণদৃষ্টিকে প্রসারিত কর। চেয়ে দেখ- কত অফুরন্ত ভালবাসা এই ধরণীর প্রতিটি পরতে পরতে প্রবহমান। স্বামী ভালবাসে স্ত্রীকে, স্ত্রী ভালবাসে স্বামীকে। মা-বাবা ভালবাসে সন্তানকে, সন্তান ভালবাসে মা-বাবাকে। ভাই ভালবাসে বোনকে, বোন ভালবাসে ভাইকে। লেখক ভালবাসে পাঠককে, পাঠক ভালবাসে লেখককে। শ্রমিক ভালবাসে মালিককে, মালিক ভালবাসে শ্রমিককে। শিক্ষক ভালবাসে ছাত্রকে, ছাত্র ভালবাসে শিক্ষককে। রাজা ভালবাসে প্রজাকে, প্রজা ভালবাসে রাজাকে। এভাবেই পরিবার, সমাজ, শিক্ষালয়, কর্মক্ষেত্র, রাষ্ট্র সবখানে প্রবাহিত হয় ভালবাসার সুশীতল বাতাস। ভালবাসার ভেলায় ভেসে মানবের জীবন মোহনায় আসে অফুরন্ত ও অনাবিল সুখের স্রোতধারা। এ ভালবাসা কোন সময়ের সীমায় আবদ্ধ নয়; নয় কোন ব্যক্তি বিশেষের জন্য। ভালবাসা চিরন্তন। সবখানে, সবসময়, সবার জন্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যাম্পেলরের জন্য ভালবাসা; ভালবাসা রাস্তার টোকাইয়ের জন্যও। এটাই ভালবাসার মানবিক বিশ্লেষণ। আর এ ভালবাসার পরম সুখময় ব্যঞ্জনা কভু ব্যত্যয় ঘটলেই বাঁধে যত বিপত্তি। পরিবার, সমাজ, শিক্ষালয়, কর্মক্ষেত্রসহ মানব

জীবনের প্রতিটি দ্বারে নেমে আসে বিপর্যয়। সৃষ্টির সেরা মাখলুক মানুষ হয়ে পড়ে বন্য প্রাণীর চেয়েও নিকৃষ্ট। কোন মানুষের হৃদয় থেকে যখন ভালবাসা নামক মানবিক বীজটি নষ্ট হয়ে যায়, সে মানুষটি তখন আত্মঅহমিকায় গর্জে উঠে ক্ষুধার্ত শার্দূলের ন্যায়। এভাবেই মানব জীবনে নেমে আসে মহা-বিপর্যয়। জন্ম নেয় সৃষ্টি নামের শত অনাসৃষ্টি। মুমূর্ষ হয়ে পড়ে সমাজব্যবস্থা। ভেঙ্গে যায় মানবতার সুপ্রাচীন ইম্পাত কঠিন ইমারত। মোটকথা: ভালবাসাহীন পৃথিবী মানুষের বসবাস উপযোগী নয়। এমনকি কোন প্রাণীও বাস করতে পারে না প্রেম-ভালবাসাহীন জগতে।

কিন্তু! আজকের আরিফদের ক্ষীণদৃষ্টিতে ভালবাসা মানে, Wrong নাম্বার থেকে শুরু হওয়া এমন একটা অনৈতিক সম্পর্ক, যার শেষদ্বার হচ্ছে দু'জনের যেকোন একজন অথবা উভয়েরই আত্মহত্যা। তাদের কাছে ভালবাসার বিশ্লেষণ হচ্ছে, কুটকৌশলে মেয়েদের পটিয়ে অতঃপর বাবার পকেট খালি করে তাদের সাথে ডেটিং মারা। আর তার বাস্তব উদাহরণ হচ্ছে, পাশ্চাত্যের নোংরা সংস্কৃতি থেকে আমদানিকৃত ফ্রি মাইন্ড, নো মাইন্ড, ফ্রি সেক্স, অপেন সেক্স, লিভ টু গেদারসহ চরিত্র ও সমাজ-সভ্যতা বিধ্বংসী কার্যাবলি। এটাই কি প্রকৃতার্থে ভালবাসার অর্থ, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ? না, এটাকে কখনও ভালবাসা বলা যেতে পারে না। কারণ, ভালবাসা কখনো জীবন কেড়ে নেয় না; বরং মৃতপ্রায় জীবন ভালবাসার স্নিগ্ধ পরশে হয়ে উঠে তেজোদ্দীপ্ত। অনুভব করে এক অনুপম সজীবতা।

এবার গোড়ায় ফিরে যাই, এতক্ষণের আলোচনায় কি বুঝলে? হ্যাঁ! দিবসবদ্ধ ভালবাসায় আমি বিশ্বাসী নই। কারণ, ভালবাসাতো সবখানে, সবসময়, সবার জন্য, তাই “বিশ্ব মা দিবস” নামে ভালবাসা নিয়ে মায়ের সাথে ভাঁওতাবাজীর পক্ষপাতি যেমন আমি নই; ঠিক তেমনি আমি বিশ্বাস করি না, পহেলা বৈশাখে পান্তা-ইলিশ খেয়ে ভালবাসার রশিকে ময়বুত করার শয়তানী মন্ত্র। কেননা, পান্তা আর ইলিশ দুটোই অসাড় বস্তু মাত্র। বন্ধু! আমি আশ্চর্য হই তোমার কথা ভেবে। তুমিতো নিজেকে প্রগতিশীল ও সৃজনশীল মানসিকতার অধিকারী বলে গলা ফাটাচ্ছে, যদি তাই হয়ে থাকে তাহলেতো তুমি পান্তা-ইলিশ খেতে পারো না। কারণ, তোমাকে যদি

আমি বলি, একটা মৃত (অসাড়) কাঠাল গাছে কাঠাল ধরেছে। তুমি কি তা বিশ্বাস করবে? অবশ্যই না। কেননা মৃত কাঠাল গাছ অসাড় বস্তু মাত্র। আর কোন অসাড় বস্তুর কার্যক্ষমতায় তুমি বিশ্বাস কর না। তাহলে এবার মাথা থেকে ধারকৃত পশ্চিমা ধ্যান-ধারণাগুলো ঝেড়ে ফেলে আমাকে বল, পান্তা-ইলিশ দুটোই কি অসাড় বস্তু নয়???

আবার ফিরে চল তানিয়ার জীবনবৃত্তান্তে—

কিছুদূর এগিয়ে তানিয়া লিখেছে তার আবু-আম্মুর বিস্ময়কর পরিবর্তনের কথা। সে তার আম্মুর ব্যাপারে লিখেছে, বাইরে কোথাও বের হওয়ার সময় ভূতুড়ে একটা সাজ ধরেন। আবার আমাকেও ভূতুড়ে পোষাক বোরকা পড়ার তালিম দেন...

মহান রবের ফরয বিধান পর্দা বা বোরকাকে ভূতুড়ে পোষাক বলাতে তোমার হৃদয়ে হয়তো রক্তক্ষরণ শুরু হতে পারে। কিন্তু এ যুগের হাজারও তানিয়াদের কাছে এটাই বেশ যুক্তিসঙ্গত (অবশ্য খোঁড়া যুক্তিতে)। কেননা, তারাতো মহান রবের দেয়া সভ্যতা-সংস্কৃতি বর্জন করে গ্রহণ করেছে বিজাতীয় কৃষ্টি-কালচার। তাই পর্দাকে তারা মনে করে আদিম যুগের সভ্যতা ও প্রগতি তথা উন্নতির পথে অন্তরায়। কিন্তু একটু ভেবে দেখ, আমাদের সুসংগঠিত জান্নাতী পরিবেশের সামাজিক অবকাঠামোতে যারা পশ্চিমা ভোগবাদী সভ্যতার কালোঁধোঁয়া ছড়িয়ে যাচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে তাদের মৌল উদ্দেশ্যটা কী? যে অযাচিত সমাজের স্বপ্ন তারা দেখছে মুসলিম অধ্যুষিত এই সমাজে, চল একটু প্রত্যক্ষ করে আসি সে সমাজের বাস্তব এবং করুণ চিত্র—

ক. আমেরিকায় প্রতি মিনিটে ২৪ জন নারী ধর্ষিতা হয়। যার বাৎসরিক সংখ্যা দাঁড়ায় ১, ২৬, ১৪, ৪০০ (এক কোটি ছাব্বিশ লক্ষ চৌদ্দ হাজার চারশত)।

খ. অন্য এক পরিসংখ্যানে জানানো হয়েছে, কথিত আধুনিক সভ্যতার ধ্বজাধারী যুক্তরাষ্ট্রে এক বছরে ধর্ষণের শিকার নারীর সংখ্যা ১,৯০,০০০০০ (এক কোটি নব্বই লক্ষ)।

গ. সম্প্রতি এক জরিপে দেখা গেছে, আমেরিকায় প্রতি বছর এক

মিলিয়ন তথা দশলক্ষ অবৈধ সন্তান ভূমিষ্ট হয় এবং এক মিলিয়ন (দশলক্ষ) অবৈধ গর্ভপাত ঘটানো হয়।

য. কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জনমত জরিপে দেখা গেছে ৭০% নগরসেবিকা যৌন নির্যাতনের স্বীকার। তন্মধ্যে ৫৬% নির্মমভাবে দৈহিক নির্যাতনেরও স্বীকার।

ঙ. শুধুমাত্র জার্মানিতে বছরে ৩৫,০০০ (পঁয়ত্রিশ হাজার) নারী ধর্ষণের স্বীকার হয়। আর এ সংখ্যা হচ্ছে পুলিশের নিকট যা রেজিস্ট্রিকৃত। পক্ষান্তরে ফৌজদারী পুলিশের মতে, যে সব ঘটনা পারিবারিক অথবা অন্য কোন কারণে রেজিস্ট্রি হয় না তার সংখ্যা উল্লেখিত সংখ্যার পাঁচগুণ। অর্থাৎ কেবল জার্মানিতেই বছরে নারী ধর্ষণের ঘটনা ঘটে ১,৭৫,০০০। (তথ্যসূত্র: ইন্টারনেট)

এটাই যদি হয় তাদের আসল চিত্র, তবে এমন সমাজ কোন সুস্থ্য মস্তিস্কধারীর কাম্য হতে পারে কি? আধুনিক সভ্যতা-সংস্কৃতি, উন্নয়ন ও প্রযুক্তির পথে পর্দা কী করে অন্তরায় হলো? তবে কি নারীর স্বীয় দেহ আচ্ছাদনের বস্ত্র বর্জন করে পুরুষের সামনে নগ্ন হওয়াই উন্নয়নের পূর্বশর্ত? নারীকে পুরুষের সাথে তার পাশবিক সম্বোগ ও পশুত্বের প্রবৃত্তি নিবৃত্ত করাই কি উন্নয়ন? আধুনিকতার এটাই কি উপমা যে, নারীর শুধুমাত্র বাহ্যিকভাবে দেহ থাকবে, থাকবে না তার আত্মিক সম্ভ্রম আর আত্মমর্যাদা?

হে মরণাশ্রু তুল্য যৌনবাদের আহ্বায়করা, ক্ষীণদৃষ্টিকে প্রসারিত কর। ঝেড়ে ফেল ধারকৃত পঁচা গোবরগুলো। চেয়ে দেখ সৌদী আরবের দিকে। কই! পর্দাতো তাদের উন্নয়নে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে না? বরং যদি প্রশ্ন করা হয়, পৃথিবীর কোন্ রাষ্ট্রে সবচেয়ে কম অপরাধ সংঘটিত হয়? অবশ্যই উত্তর হবে, সৌদী আরব। তুমি কি কখনও ভেবে দেখেছ, এর কি কারণ? হ্যাঁ, এর কারণ একটাই। তা হচ্ছে, কুরআনী বিধান। কুরআনের সুমহান বিধান কোন রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হলে, সে রাষ্ট্রে এভাবেই প্রবাহিত হয় শান্তির সুশীতল বায়ু।

আলহামদুলিল্লাহ! আজ সৌদী আরবে পর্দার বিধান মেনেই সেদেশের মহিলারা দখল করেছে শিক্ষা-দীক্ষার সর্বোচ্চ স্থান। অর্জন করেছে সর্বোচ্চ

ডিগ্রি। নারীরা তাদের উপযোগী ক্ষেত্রগুলোতে সুদক্ষতার পরিচয় দিচ্ছে। সেখানকার নারীরা একদিকে যেমন ডাক্তার, শিক্ষিকা, অধ্যাপিকা, তত্ত্বাবধায়ক ও গবেষক; অপরদিকে পারিবারিক অবকাঠামোতে একজন আদর্শ জননী হিসেবে পালন করে যাচ্ছে আগামী প্রজন্ম গঠনের সুমহান দায়িত্ব। কই! তাদের পর্দা, লজ্জা, সংযমশীলতাতো তাদের উন্নয়নের পথে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে না? সে দেশের মুসলিম মহিলারা প্রমাণ করেছে, বেশ্যা নারীদের মতো নিজেদের প্রদর্শন, নগ্নভাবে উপস্থাপন, পরপুরুষের সাথে সংমিশ্রণ ও নিজেদেরকে অশ্লীলতার চোরাস্রোতে ভাসিয়ে না দিয়েও দেশ-জাতির সেবা করা যায়।

প্রকৃতপক্ষে নগ্নসংস্কৃতির আহ্বায়করা উন্নয়ন-অগ্রগতি মোটেই চায় না। তারা চায়, আধুনিকতার জালে আটকিয়ে নারীকে পুরুষের কুপ্রবৃত্তি নিবৃত্তের জন্য উন্মুক্ত ভোগের বস্তুতে পরিণত করতে। তারা চায়, পৈশাচিক যৌনাচারের লক্ষ্যে পর্দার আবরণ থেকে নারীকে বের করে ইসলামপূর্ব সেই জাহেলি বর্বরতার দিকে ঠেলে দিতে। পুরুষের পদতলে দাবিয়ে রাখতে চায় জাতির শ্রেষ্ঠসম্পদ নারীকে। আর চায় যখন ইচ্ছে তখন তাদের যৌনকামনা পূরণ করতে। নারীকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় কেবল ভোগের পণ্য হিসেবে। তারা চায় এমন মহিলা, যার থাকবে না কোন লজ্জা থাকবে না কোন আত্ম-মর্যাদাবোধ। দৈহিক অবকাঠামোতে মানুষ মনে হলেও বাস্তবিক অর্থে যারা হবে পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট।

বিপরীতপক্ষে পর্দা হচ্ছে নারীর ইচ্ছা-সম্মান ও সম্ভ্রম সংরক্ষণের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। পর্দা নারীকে অশ্লীল, কদর্য, ও কুদৃষ্টি থেকে হিফায়ত করে। যারা বেপর্দা ও নগ্নস্বাধীনতার তিক্ত স্বাদ আনন্দন করেছে এবং অশ্লীলতা ও অবাধ মেলামেশার তপ্ত আগুনে দগ্ধ হয়েছে, আজ তারা ই পর্দার উপর গুরুত্বারোপ করেছে। এক্ষেত্রে আমেরিকার মহিলা সাংবাদিক ‘হিলসিয়ান স্তাসমারীর’ ঘটনা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। হিলসিয়ান স্তাসমারী একবার সৌদী আরবে মাত্র কয়েক সপ্তাহ অবস্থানের পর স্বীয় দেশে ফিরে গিয়ে বলেছিলেন, “নিশ্চয় আরব সমাজ একটি পূর্ণাঙ্গ ও নিরাপদ সমাজ। এই সমাজের রীতিনীতি একান্তভাবে গ্রহণীয়। কেননা এই যুক্তিসঙ্গত প্রথা যুবক-যুবতীদের সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করে। এই সমাজ ইউরোপ-

আমেরিকার সমাজব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। তোমাদের (মুসলিমদের) নিকট উত্তরাধিকার সুত্রে প্রাপ্ত যে চরিত্র রয়েছে, তা নারীর সীমাবদ্ধতাকে বাধ্যতামূলক করে। পিতা-মাতার সম্মান করা ও এ ধরনের বহু বিষয়কে আবশ্যক করে এবং সর্বোপরী পাশ্চাত্যের সেই স্বৈচ্ছাচারিতাকে বর্জন করে, যা বর্তমানে ইউরোপ-আমেরিকার পরিবার ও সমাজ ব্যবস্থাকে বিনাশ করে ফেলেছে। সুতরাং অবাধ মেলামেশা থেকে বিরত থাক। নারী স্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ কর। ফিরে এসো পর্দার শান্তিময় সমাজে। (গৃহীত- পর্দা একটি ইবাদাত: ২৪-২৯ পৃঃ)

খুব ভালবাবে বুঝার চেষ্টা করো, একজন আমেরিকান মহিলা তার সমাজের অবক্ষয় প্রতিরোধে উদাত্ত আহবান জানাচ্ছেন পর্দাব্যবস্থার প্রতি। অশ্লীলতার চিতায় দক্ষ শত জীবনীর প্রত্যক্ষ এক স্বাক্ষী তোমাকে সতর্ক করছেন অবাধ মেলামেশা ও স্বৈচ্ছাচারিতার ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে। যা ইউরোপ-আমেরিকার পারিবারিক ও সামাজিক অবকাঠামোকে ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে। শুধু হিলসিয়ান স্তাসমারীই নয়; যৌন স্বাধীনতার পঁচা পুকুরে কচুরিপানার ফুলের মতো বেড়ে উঠা মেয়েরা আজ অকল্পনীয় হারে আশ্রয় নিচ্ছে পর্দার গভিতে। সে দিন সৌদী থেকে কল দিয়ে এমনই একটি ঘটনা শুনালেন এক দীনী ভাই। ঘটনাটি শুনলে হয়তো তুমিও উপকৃত হবে। তাই বর্ণনা করছি—

এক সৌদী মহিলা স্বামীর সাথে তাওহীদ ও পর্দার দেশ ছেড়ে পাড়ি জমাল যৌনস্বাধীনতার দেশ ফ্রান্সের প্যারিসে। স্বামীর ইচ্ছানুযায়ী প্লেনেই খুলে ফেলল বোরকা। প্ল্যান ফিরে গেল সৌদীতে। সাথে ফিরে গেল বোরকাটাও। অতঃপর মহিলা স্বামী-সন্তানসহ বসবাস করতে লাগল প্যারিসে। অবসর পেলেই বের হয়ে যায় ভ্রমণে। কখনও বা চিড়িয়াখানা, জাদুঘরে, সমুদ্র সৈকতে। কখনও বা বার, থিয়েটার, হোটেল বা মার্কেটে। এভাবেই ধীরে ধীরে মিশতে থাকলো পরপুরুষদের সাথে। ছুড়ে ফেললো নিজ সভ্যতা-সংস্কৃতি। বিউটি পার্কারে গিয়ে আধুনিক সেজে আসতে দেখে স্বামীও বড় খোশ। শুরু হতে লাগল শয়তানী জীবন। পশ্চিমা সভ্যতার বিষফল যৌনস্বাধীনতার কালোধোঁয়া আচ্ছন্ন করল তাদের। এখন

নাইট ক্লাবে যেতেও বিবেকে বাঁধে না দু'জনের একজনেরও।

একদিন এক মার্কেটে গেল স্বামী-স্ত্রী দু'জন কিছু গিফট কিনতে। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ লক্ষ্য করল একটা ভিন্ন প্রকৃতির মহিলা পাশের দোকানেই কিছু কেনাকাটা করছে। যার গোটা দেহটাই আপাদমস্তক ঢাকা, এমন কি হাতে হাতমোজা পায়ে পামোজা পর্যন্ত পরা। পর্দাওয়ালী মহিলাটির দিকে তার চক্ষু দুটি তাকিয়ে আছে অপলক। ঈমানী মেঘ যেন ছায়া করে আছে তাকে। চলনে-বলনে রয়েছে যথার্থ ভদ্রতা। যেন হিদায়াতের কিরণ বিচ্ছুরিত হচ্ছে তার থেকে। সৌদী মহিলাটির মনে এক আজীব কম্পন শুরু হয়ে গেল। তাওহীদের সুমহান বারতা তার হৃদয় ভূবনে যেন বার বার ধ্বনিত হচ্ছিল। সে তাকীদেই হয়তো মহিলাটি ছুটে গেল বোরকা পরিহিতা মহিলাটির কাছে। প্রথমেই সালাম দিয়ে প্রশ্ন করল— বোন, আপনি আরবী মহিলা? সালামের উত্তর দিয়ে মহিলাটি বলল— না, আমি বৃটিশ মহিলা। আলহামদুলিল্লাহ! আমি আমার স্বামী ও ছেলে-মেয়ে নিয়ে দু'বছর হলো ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমার নাম খাদিজা। আপনি কি আযমী, না আরবী? হ্যাঁ, আমার বাড়ি সৌদী আরবে। কিন্তু সৌদী আরবতো বোরকা-হিজাবের দেশ। আপনার বোরকা কোথায়? সে অনেক কথা, বোন! তো আপনি এদেশে কিভাবে পর্দার বিধান পালন করেছেন? এইতো, আল্লাহ আমাদের যেভাবে বিধান দিয়েছেন সেভাবেই পালন করছি। কিন্তু আমি আশ্চর্য হচ্ছি আপনার কথা ভেবে। নকলের মেলায় এসে আপনি আসল হারিয়ে বসেছেন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভূমিতে ভূমিষ্ঠ হয়ে সেই শ্রেষ্ঠ পরিবেশে বেড়ে উঠেও আজ মিথ্যে চোরাবালি দেখে হারিয়েছেন স্বর্ণখণি। পাশেই মধুনহর রেখে হাবুডুবু খাচ্ছেন কদমায় ভরা নর্দমায়। আফসোস! শত আফসোস আপনার জন্য বোন। আল্লাহর জন্যই প্রসংশা যিনি আমাদের পথ দেখিয়েছেন শান্তির। যার ফলে আমরা পূর্বের অসভ্য ও কদর্য নর্দমা থেকে বের হয়ে সিন্ত হতে পেরেছি তাওহীদের স্বচ্ছ ও নির্মল ঝর্ণাধারায়। মুক্তি লাভ করেছি সেই জীবন থেকে, যেখানে নারীর কোন মূল্য নেই। যে জীবনে নারী খুবই সস্তা ভোগ্যপণ্য। ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পর আমি পেয়েছি আমার নারীত্বের মর্যাদা। পেয়েছি মানুষ হিসেবে

বেঁচে থাকার অধিকার। ইসলাম আমাদের দিয়েছে পর্দার সুমহান ব্যবস্থা। যা আমার সতীত্বের গ্যারান্টি। পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা শিখিয়েছে ইসলাম। নারীর আসল কর্ম ও অবস্থানক্ষেত্র শিখিয়েছে ইসলাম। স্বামী-স্ত্রীর পবিত্র এ বন্ধনের পূর্ণ মর্যাদা দিয়েছে ইসলাম। তাই বলছি, বোন! ফিরে যান ইসলামের দিকে। প্রত্যাবর্তন করুন পর্দার সেই সভ্য সমাজে। যেখানে আপনি খুঁজে পাবেন জীবনের প্রকৃত স্বাদ আর ঈমানের পরম তৃপ্তি।

এ সুদীর্ঘ উপদেশের সাথে সাথে কুরআনের আয়াত ও সহীহ হাদীসও শুনতে লাগলো বোরকাওয়ালী মহিলাটি। এ যেন মায়ের কাছে মামার বাড়ির গল্প! কিন্তু মা যে তার নিজ মায়ের বাড়ির কথা আজ বিস্মৃত!!!

বৃটিশ মহিলা খাদিজার কথাগুলো আলোড়ন সৃষ্টি করল সৌদী মহিলার হৃদয়তন্ত্রীতে। হৃদয়বনে শুরু হলো হুল্লোড়। নির্বাক দাড়িয়ে রইল সে খর্জুর বৃক্ষের ন্যায়। গন্ডদেশ বেয়ে প্রবাহিত হতে লাগল তপ্ত অশ্রুর স্রোতধারা। স্তব্ধ হয়ে গেল হৃদয়ের সব মিথ্যে উচ্ছ্বাস। পর্দার দেশের এক মহিলাকে নসীহত করে গেল বেপর্দার দেশের এক মেয়ে। সেই মেয়ে, যার জীবন কেটেছে যৌনস্বাধীনতার পঁচা পুকুরে কচুরিপানার ফুলের মতো। যে প্রতিপালিত হয়েছে ভূয়া সভ্যতা ও নকল সংস্কৃতির পানি-বাতাসে। তাকে শিক্ষা দিয়ে গেল, যে প্রতিপালিত হয়েছে ইসলামী সভ্যতার ছায়াতলে সুদর্শন গোলাবরূপে। যে সেই দেশের মানুষ, যে দেশে তাওহীদের আলো আছে। সভ্যতার পর্দা আছে। ইসলামী আইন-আদালত আছে। সৎকাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ করার মতো বিশেষ অফিস ও কর্মচারী আছে। প্রত্যেক স্কুল-কলেজে ইসলামী শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। যে দেশে ছেলে-মেয়েদের জন্য পৃথক পৃথক স্কুল-কলেজ আছে। যেখানে বেনামাযী ও বেদীন মহিলারাও পর্দার বিধান পালন করে।

সৌদী মহিলাটি বড় লজ্জিতা ও অনুতপ্তা হলো। অশ্রুসজল নয়নে বাসায় ফিরে এসে স্বামীকে বলল, ঐ বোরকা পরিহিতা মহিলা আমার চক্ষু খুলে দিয়েছে। আমার চোখের হারিয়ে যাওয়া দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছে। আমি দেশে ফিরে যেতে চাই। আমি বোরকা পড়তে চাই। বলে ঢুকলে কেঁদে উঠল। একথা শুনে হোঁ হোঁ করে হাসতে শুরু করল তার স্বামী। বলল,

একটা সেকলে মেয়ের কথায় তুমি গলে গেলে? মহিলা বলল, ‘না, আমি গলে যাইনি। বরং আরও দৃঢ় হয়েছি। গলেতো গিয়েছিলাম তোমার কথায়। তুমি এমন স্বামী যার কোন আত্মমর্যাদাবোধ বলতে কিছু নেই। তুমি পরপুরুষকেও আপন স্ত্রীর অংশিদার কর। তুমি হয় আমাকে দেশে পাঠাও; নয় তালাক দাও!

পরিশেষে মহিলা তার স্বামীর সাথে যুক্তিতর্কে বিজয়িনী হলো। স্ব-পরিবারে ফিরে এলো নিজ জন্মভূমি সৌদী আরবে। ফিরে এলো হারামাইনের দেশে। আয়িশা, হাফসা, যায়নাব, ফাতিমাদের জান্নাতী পরিবেশে।

হে যুগের দিগভ্রান্ত তানিয়া, এখনও কি তোমার বুঝতে বাকি আছে ওদের আর আমাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য? প্রিয় বোনটি আমার, এখনও কি তোমার প্রত্যাবর্তনের সময় হয়নি? ঐ চেয়ে দেখ, তোমার মতো কত বোন আজ অবশেষে ফিরে আসছে পর্দার জান্নাতী গন্ডিতে।

আবার চল মূলে ফিরে যাই। পাশ্চাত্যের নোংরা সংস্কৃতির তল্লিবাহী কথিত প্রগতি (আসলে দুর্গতি)-বাদীদের সমাজ বিধ্বংসী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে মূল প্রতিবন্ধক হলো, জাতির শিক্ষিত, সচেতন, অতন্দ্রপ্রহরী আলিমসমাজ। আর তাই দুর্গতিবাদীরা শুরু করল সেই আলিমদের সম্পর্কে মিথ্যা প্রোপাগান্ডা। তাদের উপর চাপিয়ে দিলো জঙ্গিবাদের মিথ্যা অপবাদ। এক্ষেত্রে তার বেশ সফলতা লাভ করেছে। যার বাস্তব প্রমাণ, এ যুগের হাজারও তানিয়া আজ দাড়ি-টুপি দেখলেই ভ্রুকুণ্ঠিত করে, নাক ছিটকায়, কটুবাক্য ছুঁড়ে। তাদের দেখলেই যেন গায়ে কচুর পানি লাগে। তানিয়াতো তারই উদাহরণ। সে তার বড় মামা সম্পর্কে লিখেছে, “আম্মু-আব্বুর এই পরিবর্তনের মূলে রয়েছে আমার বড় মামা। মুখে ইয়া বড় বড় দাড়ি, বাবড়ি চুল। ঠিক যেন আদিম যুগের মানুষ। কথা-বার্তা শুনলে মনে হয় যেন পুরা একটা জঙ্গি।”

তানিয়া উপরোক্ত কথাগুলো লিখেছে সে মহান ব্যক্তিটি সম্পর্কে, যার অনুপম ছোঁয়ায় পাল্টে গেছে তার আব্বু-আম্মুর জীবনের গতিধারা। এ জন্য আমি তানিয়াকে দোষারোপ করতে চাই না। কারণ এ উদ্ভট

মানসিকতা নিয়ে সে জন্মগ্রহণ করেনি। পাশ্চাত্যের নোংরা সংস্কৃতির তল্লিবাহী মিডিয়াগুলোর কল্যাণে (?) তার মস্তিষ্কে এই উদ্ভট চিন্তা স্থান লাভ করেছে। তো যাইহোক, কথাগুলোর খানিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন মনে করছি।

তানিয়া তার মামাকে আখ্যায়িত করেছে আদিম যুগের মানুষ হিসেবে। প্রথমেই আমাদের বুঝতে হবে আদিম যুগ আসলে কী? আদিম যুগ বলতে আমাদের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের বিদ্যালয়গুলোর পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞান ইত্যাদি বইগুলোতে মিথ্যা এবং অযৌক্তিক কিছু কথা-বার্তা শিক্ষা দেওয়া হয়। তার সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে—

এটা এমন একটা যুগ, যে যুগে মানুষ সভ্যতা-সংস্কৃতি কী জিনিস বুঝতো না। পশু শিকার করে তার গোশত আগুনে পুড়িয়ে খেতো এবং তার চামড়া দিয়ে নিজেদের দেহ আবৃত করতো ইত্যাদি। অথচ গুটিকয়েক নাস্তিক ব্যতীত পৃথিবীর সব ধর্ম-মতের মানুষ একথা বিশ্বাস করে যে, আদম আলাইহিস সালাম হচ্ছেন প্রথম মানব তথা আদি পিতা। আদম (আ.)-কে মাটির সকল উপাদানের সার নির্যাস একত্রিত করে আঠালো ও পোড়ামাটির ন্যায় শূন্য মাটি দিয়ে সুন্দর অবয়বে আল্লাহ (সুব.) নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন। (সূরা সাফ্ফাত:১১, সূরা রাহমান:১৪, সূরা তীন:৪)

অতঃপর আদমের পাঁজর থেকে তাঁর স্ত্রী হাওয়া (আ.)-কে সৃষ্টি করেন। (সূরা নিসা:১) স্বল্পকাল জান্নাতে বসবাসের পর প্রতিনিধির মর্যাদায় অভিষিক্ত করে আল্লাহ (সুব.) তাদের প্রেরণ করেন পৃথিবীতে। (সূরা বাকার: ৩০-৩৯, সূরা আ'রাফ: ১১-২৫ ইত্যাদি) অতঃপর আল্লাহ (সুব.) আদম-হাওয়ার মাধ্যমেই মানববংশ বিস্তারের এক অনুপম ধারা চালু করেন। (সূরা নিসা:১, সূরা আ'রাফ:১৮৯, সূরা যুমার:৬, সূরা হুজুরাত:১৩ ইত্যাদি) এভাবেই যুগ যুগ ধরে মানববংশ বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রয়েছে। পবিত্র কুরআনুল কারীমের বর্ণনা অনুযায়ী প্রথম দিন থেকেই মানুষ পূর্ণ চেতনা ও সুস্থ জ্ঞানসম্পন্ন সভ্য মানুষ হিসেবেই যাত্রারম্ভ করেছে এবং আজ অবধি তা অব্যাহত রয়েছে। সুতরাং গুহামানব, বন্যমানব, আদিম মানব ইত্যাদি বলে কিছু কিছু কল্পনাবিদ (!) আমাদের যা শুনিয়ে থাকেন,

তা অলীক কল্পনা বৈ কিছুই নয়। সূচনা থেকে এ পর্যন্ত এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় মানুষ কখনোই মানুষ ব্যতীত অন্যকিছু ছিল না। মানুষ বানরের উদ্ভূত রূপ বলে চার্লস ডারউইন (১৮০৯-১৮৮২) যে “বিবর্তনবাদ” (Theory of Evolution) পেশ করেছিলেন তা বর্তমানে সুস্থ মস্তিষ্কধারী প্রতিটি মানুষ কর্তৃকই প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

এখানে চিন্তার অবকাশ রাখে যে, তাহলে পরিবেশ পরিচিতি সমাজ অথবা বিজ্ঞান-এর নামে আমাদের কোমলমতি সন্তানদের কি কুরআন বিরোধী এবং অযৌক্তিক বিবর্তনবাদ শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে? তাদের কি একথা শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যে, আদি পিতা আদম (আ.) ছিলেন অসভ্য যুগের আনকালচার্ড একজন মানুষ? (নাউয়বিলাহ) বিবেকবান প্রতিটি মানুষের কাছে বিষয়টি ভেবে দেখার একান্ত অনুরোধ রইল। বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আবার ফিরে চল তানিয়ার জীবনবৃত্তান্তে:

তানিয়া তার বড় মামাকে যে দুটি বিশেষণে বিশেষিত করেছে, তার প্রথমটি ছিল আদিম যুগের মানুষ। যার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা উপরের আলোচনায় তুলে ধরার চেষ্টা চালিয়েছি। আর দ্বিতীয় বিশেষণটি ছিল “জঙ্গি”। নাতিদীর্ঘ আলোচনা নয়; কেবল শাব্দিক বিশ্লেষণেই সমাপ্তি টানবো, ইনশাআল্লাহ। জং শব্দের অর্থ হচ্ছে যুদ্ধ বা যুদ্ধের ময়দান। তাহলে জঙ্গি মানে হয় যোদ্ধা। যারা যুদ্ধ করে তাদের জন্য এটা একটা বিশেষণ বা উপাধি। এই সম্মানি বিশেষণটিকে যারা গালি হিসেবে ব্যবহার করে, তাদেরকে নিশ্চয় বোকার চেয়েও নিচু কিছু ভাবে হবে।

ময়মনসিংহের এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে একটা দাওয়াতী সফরে গিয়ে সর্বপ্রথম এই জঙ্গি বিশেষণে বিশেষিত হয়েছিলাম। সেদিনের অনুভূতিটা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। সফর সঙ্গী ছিলেন আমির হামযা ভাই। একমাত্র সে-ই বলতে পারবে আমি সেদিন কতটা উল্লসিত ছিলাম। বারবার আমাকে এই কথাটাই উৎফল্ল করে তোলছিল যে, জীবনে জং বা যুদ্ধ কি জিনিস দেখার সুযোগ কপালে জোটল না; আমি পেয়ে গেলাম জঙ্গি বা যোদ্ধা খেতাব! যারা ‘৭১-এ যুদ্ধ করেছে অন্তত তাদেরকেও যদি জঙ্গি

বলা হতো তাহলেও হয়তো শব্দটার মান রক্ষা পেতো। উপরোক্ত শব্দবিশ্লেষণটি যদি খুব গভীরভাবে অনুধাবন করে থাকো, তাহলে এবার তুমি চিন্তা করো, যারা এ বিশেষণটিকে গালি হিসেবে ব্যবহার করে থাকে, তারা কত বড় নির্বোধ আর আহাম্মক!!!

এবার মূল প্রসঙ্গে ফেরা যাক। তানিয়া লিখেছে— “তাই আরিফের সাথে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপনেও বাঁধ সাধেনি বিবেকে। স্ব-ইচ্ছায় বারংবার আবদ্ধ হয়েছি তার বাহুবন্ধনে। কুষ্ঠাবোধ করিনি একই বেড়ে রাত যাপনে।” উপরোক্ত কথাগুলোর কোন বিশ্লেষণ আমি করতে চাই না। কারণ, তানিয়ার এই ফ্রিমাইন্ড সংস্কৃতির শেষ ফলাফলতো তুমি দেখতেই পাচ্ছে। সে নিজেই বর্ণনা করেছে, “অন্যদিকে আরিফও যেন দিন দিন একটু অন্যরকম হয়ে উঠে। আগের মতো কল দেয় না, খোঁজ-খবর নেয় না, এসএমএস পাঠালে উত্তর দেয় না, কল দিলে খুব ব্যস্ততা দেখায় ইত্যাদি।” হ্যাঁ এটাইতো নিয়ম! বাজার থেকে কলা কিনে কলা খেয়ে খোসাটাতো সবাই রাস্তায়ই ফেলে দেয়। পকেটে রেখে দিয়ে অভদ্রতার পরিচয় দেয় না। কারণ মূল্য যা তাতো ভেতরের অংশটারই। খোসার জন্যতো আর কেউ কলা কিনে না। তেমনি আরিফও চেয়েছিল তানিয়ার সম্ভ্রমখানি। তাতো সে পেয়েই গেছে, ব্যস! এখন খোসা দিয়ে সে কী করবে? কলার প্যাঁচাল পাড়তে গিয়ে এই কলার একটা গল্প মনে পড়ে গেল। শূনেছিলাম সে অনেক দিন আগে—

গুলিস্তান মোড়ে কলা বিক্রি করতো করিম আলী নামের এক লোক। বেচাকেনা ভালই চলছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন তার মনে জেগে উঠল আরও বেশি বিক্রির লোভ। কী করা যায় ভেবে অস্থির। পরামর্শ করল আরেক অভিজ্ঞ হকারের সাথে। সে বুদ্ধি দিলো, সবাইতো কলা বেচে খোসা শুদ্ধ। আপনে খোসা ছুলাইয়া বেচবেন। এই শহরের মানুষ অইল শ্রেষ্ঠ আইলসা। কলা ছুলাইয়া দিলে দেখবেন সবাই ঝাপাইয়া পড়ব আপনার দোহানে।

অতঃপর করিম আলী পরদিন সমস্ত কলার খোসা ছাড়িয়ে নিয়ে হাযির হলেন গুলিস্তান মোড়ে। কিন্তু একি! কেউতো কলা কিনছেই না বরং হাসি তামাশা করছে। সকাল পেরিয়ে দুপুর গড়াচ্ছে এখনও একটা কলাও বিক্রি

করতে পারেননি। ভেবে কোন কুল পাচ্ছিলেন না। এমন সময় একটা ট্রাক একেবারে তার কাছ ঘেষে চলে গেল। অমনি অসংখ্য ধূলিকণা প্রবেশ করল তার খোলা চোখ দু’টোতে। শুরুর হলো চোখ কচলানো। মিনিট দু’য়েক কেটে গেল এভাবেই। অতঃপর চোখ তোলে তাকাতেই একেবারে হতবিহ্বল হয়ে পড়লেন। হায়! হায়! এইডা কি অইল। সব কলা ধুলায় মাইখ্যা গেল। এভাবেই প্রলাপ বকে চলছেন আর মাথা চাপড়াচ্ছেন। এপথ ধরেই যাচ্ছিলেন গতকালের বুদ্ধিদাতা। অবস্থা দেখে পণ্ডিত মশাই (!) তার পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, আরে মিয়া এ রহম করতাহেন কেন? কী হইছে হুনি? করিম আলী সবকিছু খুলে বললেন পণ্ডিত মশাইকে। সব শূনে পণ্ডিত মশাই বললেন, চিন্তার কোন কারণ নাই। এক কাজ করেন, পকেটে যা কয় টেহা আছে, তা দিয়া গল্লিফ সিগারেট কিনেন। আর একহালি কলার লগে দুইটা গল্লিফ (গোল্ডলিফ) ফিরি লাগান। বেচারী কলা বিক্রেতা বুদ্ধিটা খারাপ মনে করলেন না। তাই লাগিয়ে দিলেন, “একহালি কলার সাথে দুইটা গোল্ডলিফ ফ্রি!”

এপথ ধরেই হাঁটছিল এক যুবক। ঠাট্টাচ্ছিলে জিজ্ঞেস করল, চাচা! কলা কত টাকা হালি? তিনি বললেন, লও বাজান, চাইর টেহা আলি; লগে গল্লিফ দুইটা ফিরি! যুবক ভাবল, ভালইতো! খুচরা কিনলে দু’শলা গোল্ডলিফ ছয়টাকা; আর এখানে পাচ্ছি মাত্র চার টাকায়! বলল, চাচা! আমাকে দুই হালি দেন।

কলা বিক্রি করতে পেরে চাচার যেন খুশিতে আর তর সইছে না। মনে মনে ধন্যবাদ দিতে থাকলেন পরামর্শদাতাকে। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত কলা বিক্রি হয়ে গেল। অতঃপর মনের সুখে পরম যতনে টাকাগুলো ভাঁজ করতে করতে গুণতে লাগলেন। টাকা গুণা শেষ। একি! মাত্র আশিটাকা!! নাহ্ ভুল হয়েছে বোধ হয়। আবার গুণলেন। হ্যাঁ, আশি টাকাইতো! তার মানে? মানে একেবারে সোজা। কলাতো গেল গেলই; সাথে মূলপুঁজি থেকে গেল বিশটাকা! আবার শুরু করলেন কান্নাকাটি। সারাদিন ধরেই তার এসব কর্মকাণ্ডের নিরব দর্শক ছিলেন শরৎ বিক্রেতা আব্দুর রহীম। এবার তিনি এগিয়ে এলেন, বললেন, ভাই কথায় বলে “লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু” কথাটা হাছাই। আপনার কলার ব্যবসাতো

আল্লাহর রহমতে ভালাই চলতছিল। কিন্তু লোভ করতে গিয়ে আজকা এই অবস্থা অইল। লোভ জিনিসটা ভাল না, বুঝছেন? এই লোভ মাইনষের পতন ডাইকা আনে। কথাগুলো এক নাগাড়ে বলে অন্যদিকে পা বাড়ালেন রহীম মিঞা।

ঘটনাটা শুনেছিলাম অনেক আগে। তখন এটা নিয়ে এতটা ভাবার সুযোগ হয়ে উঠেনি। আর এখন দেখি সমাজের বাস্তবতা এটাই। এই সেদিনওতো আমাদের সামাজিক অবকাঠামোটা ছিল কত সুন্দর! কত মযবুত ছিল সৌহার্দপূর্ণ ভালবাসায় গড়ে উঠা সভ্যতার প্রাচীর। প্রাপ্তবয়স্ক একটা মেয়ের পর্দাবিহীন বাড়ি থেকে বের হওয়াটা ছিল বড় অপরাধজনক ব্যাপার। কিন্তু সমাজের এমন পরিবেশ গায় সয়নি সমাজপতিদের। লোভ জাগল নারী জাতিকে নিয়ে। ব্যবসার লোভ; অধিক মুনাফার লোভ। তাই পরামর্শ করল পাশ্চাত্যের কতিপয় বিদগ্ধটে মস্তিষ্কধারী পন্ডিত মশাইদের সাথে। পন্ডিতদের সোজা জওয়াব, তাহলে মেয়েদেরকে মর্ডান হতে হবে। হতে হবে আধুনিক! ছিঁড়ে ফেলতে হবে সামাজিক রীতি-নীতির সব বন্ধন। মুক্ত-স্বাধীন হতে হবে। সব মুক্ত। দেহ-মন, চিন্তা-চেতনা সব। ছিঁড়ে ফেলতে হবে পর্দার খোলস।

সমাজপতিরা বেচারী কলা বিক্রেতার মতো তাই করে বসলেন। হাজার বছরের স্বকীয় ঐতিহ্যের পৃষ্ঠে পদাঘাত করে আমদানি করল বিলেতী সভ্যতা। ছলে-বলে, কুট-কৌশলে মেয়েদের নামিয়ে দেওয়া হলো রাস্তা-ঘাটে, হাটে-মাঠে। আর নারীর সতীত্ব রক্ষার হাতিয়ার পর্দাকে ছুড়ে ফেলা হলো নর্দমায়। রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে দেওয়া হলো সার্বিক ব্যবস্থাপনার আঞ্জাম। ফলতঃ বাংলার সবুজ সমারোহে জন্মগ্রহণ করেও হতভাগা একদল বাংলাদেশী না হয়ে, হয়ে গেলে সম্পূর্ণ বিলেতী। তাইতো বিলেতী কায়দায় গড়ে উঠা স্বদেশী ম্যামদের কোথাও দেখা যায় অর্ধনগ্ন আর কোথাওবা সম্পূর্ণ নগ্ন। আর তা দেখে সমাজপতিগণ খুশিতে বগল বাজাতে শুরু করল।

অতঃপর অশ্লীলতার এক প্রবল জোয়ার এসে খোসা-আবরণহীন নারীজাতিকে কলঙ্কিত করে দিলো ধর্ষণ-ইভটিজিং ও এসিডের কর্দমায়। অমনি কলা বিক্রেতার মতো মাথা চাপড়াতে শুরু করল নির্বোধ

সমাজপতিরা। আবার পরামর্শে বসল পন্ডিতদের সাথে। পন্ডিতদের পরামর্শ- যৌতুক প্রথা চালু করে দিন; আর আপনারা এর বিরুদ্ধে কড়া শ্লোগান তোলতে থাকুন। ফলে আপনারাও হবেন নির্দোষ; সমস্যারও হবে সুষ্ঠু সমাধান। সমাজপতিরা তাই করলেন। করিম আলীর কর্দমাক্ত কলার সাথে যেমন গোল্ডলিফ ফ্রি; অশ্লীলতার কর্দমায় নাকানি-চুবানি খাওয়া বেপর্দা মেয়েদের সাথে তেমনি গাড়ি-বাড়ি ফ্রি! সিগারেট লাভের আশায় ভ্রষ্ট তরুণরা যেমন হামলে পড়েছিল করিম আলীর কলার দোকানে; তেমনি গাড়ি-বাড়ি লাভের আশায় একদল লোক ঝাপিয়ে পড়ল বিয়ের ব্যবসায়। ফলে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে গিয়ে ঠেকল যে, কলা কেনার লক্ষ্য যেমন ছিল কলা নয়, সিগারেট; তেমনি বিয়ের মূল উদ্দেশ্য হয়ে গেল স্ত্রী নয়, যৌতুক! আর যৌতুক পেয়ে গেলে স্ত্রীর অবস্থাও হয়ে গেল কর্দমাক্ত কলার মতো। অর্থাৎ রাস্তায় পড়ে থাকার যোগ্য!!!

নগ্নসংস্কৃতির বিষফল যৌতুক ও ধর্ষণ-ইভটিজিংয়ের বলি হাজারও তানিয়ার ঘটনা হয়তো তুমিও জানো। তবুও এ বছরের কিছু তাজা ঘটনা তোমাকে ফের স্বরণ করিয়ে দিতে চাই-

শারীরিক সম্পর্কে স্থাপনের পর প্রেমিকাকে জবাই করল কথিত প্রেমিক

নারায়ণগঞ্জের শহরের একটি আবাসিক হোটেলে অভ্যন্তর পরিচয় এক তরুণীকে (২৩) জবাই করেছে তারই প্রেমিক সাইদুর রহমান (২৫)। শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের পর সঙ্গে থাকা একটি ধারালো ছুরি দিয়ে তাকে হত্যা করে। মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৯টায় নারায়ণগঞ্জ শহরের ১নং রেলগেট এলাকাতে রূপায়ণ নামের একটি আবাসিক হোটেলের ৪ নং কক্ষে এ ঘটনা ঘটে। (<http://primenewsbd.com>)

সিনেমা হলে গৃহবধুকে গণধর্ষণ

সিদ্ধিরগঞ্জে এক গৃহবধুকে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। ৮-১০ জন লম্পট রাস্তা থেকে তাকে তোলে নিয়ে একটি সিনেমা হলে আটকে রেখে রাতভর ধর্ষণ ও মারধর করে। বুধবার দুপুরে ওই গৃহবধু নারায়ণগঞ্জ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিশেষ ট্রাইবুনালে মামলা করেন।

মালিকগঞ্জে বাসে ধর্ষণের মামলায় দু'জনের কারাদণ্ড

ঢাকার অদূরেই মানিকগঞ্জে গত বছর একটি চলন্ত বাসে একজন গার্মেন্টস কর্মীকে ধর্ষণের ঘটনায় বাসচালক ও তার সহযোগীকে আজ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে মানিকগঞ্জের একটি আদালত। মামলার বিবরণে জানা যায়, সেই গার্মেন্টস শ্রমিক কাজ শেষে একটি বাসে করে আশুলিয়া থেকে বাড়ি ফিরে যাচ্ছিলেন। একপর্যায়ে গাড়ি বিকল হয়ে যাবার কথা বলে চালক ও তার সহযোগী যাত্রীদের নেমে যেতে বলে। যাত্রীরা নেমে গেলে টাকা ভাংতি দেবার অজুহাতে চালক ও তার সহযোগী সেই গার্মেন্টস শ্রমিককে অপেক্ষমান রাখে। এরপর বাস চালিয়ে মহাসড়কের দিকে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেই শ্রমিককে ধর্ষণ করা হয়। (bbcangla.com/ ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৪ইং)

ধর্ষণের ভিডিও ইন্টারনেটে: অপমানে নারীর আত্মহত্যা

ঝিনাইদহে শনিবার সন্ধ্যায় বিউটি খাতুন (২০) নামে এক গৃহবধু ধর্ষণের ভিডিও চিত্র ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেয়ার লজ্জায়-অপমানে আত্মহত্যা করেছে। (www.zoomangla.com/১৬ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৪ইং)

কালাইয়ে ইভটিজিং-এর শিকার শাবানার আত্মহত্যা

জয়পুরহাটের কালাইয়ে ইভটিজিং-এর শিকার স্কুল ছাত্রী ক্ষোভে-দুঃখে-অপমানে বেছে নিলো আত্মহত্যার পথ। নিজ বাড়িতে বৃহস্পতিবার সকালে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করে নবম শ্রেণির ছাত্রী শাবানা। (www.bdreport24.com/ ৫ই সেপ্টেম্বর, ২০১৩ ইং)

ইভটিজিং-এর প্রতিবাদ করায় বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রকে পিটিয়ে হত্যা

রূপসা সেতুতে ঘুরতে আসা কিশোরীদের উত্যক্ত করার প্রতিবাদ করায় রাজু ব্যাপারী (২৩) নামের উত্তরা ইউনিভার্সিটির বিবিএ শাখার এক ছাত্র খুন হয়েছেন। ঈদের দিন বিকেলে রূপসা সেতুর পূর্বপাড়ে একদল বখাটে সন্ত্রাসীর হাতুড়ি পেটায় রাজু গুরুতর আহত হয়ে খুলনা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। (www.bdprotidin.com ১৭/১০/২০১৩)

মাগুরায় ইভটিজিং-এর প্রতিবাদ করায় নিহত ১

মাগুরায় ইভটিজিং-এর প্রতিবাদ করায় রোকন মোল্লা নামের এক ব্যক্তিকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। এ সময় ইভটিজারদের প্রহারে

তিনজন আহত হন। আহতরা হলেন, কলেজ ছাত্রী মুনী খাতুন, তার বোন নবম শ্রেণির ছাত্রী লাবণী খাতুন ও নিহতের বড় ভাই ফজলুর রহমান। তাদের সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। রোববার সকাল ১১টার দিকে শহরের নিজনান্দুয়ালী পশ্চিমপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। (www.sobujbarta.com/১৪ অক্টোবর, ২০১৩)

এ কী চিত্র বাংলাদেশের!

জানুয়ারি ২০০১ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত ধর্ষণের শিকার হয়েছেন- ১০,০৮৭ জন নারী ও কিশোরী। যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন- ১,৭৮২ জন নারী ও কিশোরী। যৌতুকের দায়ে চরম নির্যাতনের শিকার হয়েছেন- ২,৭৫৩ জন নারী। বিভিন্নভাবে শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন- ১,৭৮৭ জন নারী। এসিড দফ্ণ হয়েছেন- ১,৭৯৬ জন নারী এবং লজ্জায়-অপমানে আত্মহত্যা করেছেন- ১৯৯ জন নারী ও কিশোরী। (সূত্রঃ শনিবার, ৮ মার্চ, ২০১৪ মানবাধিকার সংস্থা “অধিকার” কর্তৃক প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন)

আর কালের প্রবহমান স্রোতের সাথে সাথে উদ্বেগজনক হারে বেড়েই চলছে এসব ঘটনা। তাই শতভাগ নিশ্চয়তা দিয়ে কেউই বলতে পারবেন না যে, বর্তমান বাংলাদেশের ধর্ষণ-ইভটিজিং, এসিড নিক্ষেপ ও নারী নির্যাতনের হার কতো। হ্যাঁ, এটাই মুসলিম অধ্যুষিত ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইল এই ছোট জনপদের প্রকৃত স্বরূপ। আর এতো শুধুমাত্র পত্রিকায় প্রকাশিত ঘটনাগুলো। বাস্তবিক সমাজ যে আরও কত নিম্নস্তরে অবস্থান করছে, আশা করি তা বুঝতে কোন অসুবিধা হচ্ছে না। কিন্তু এখানে একটা বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, সবগুলো ঘটনাই ঘটেছে “আলোকপ্রাপ্ত” বৈপর্দা নারী অথবা মেয়েদের ক্ষেত্রে। কোন “ভূতৃড়ে” (পর্দাশীল) নারীর ক্ষেত্রে র্যাগিং-ইভটিজিং তথা যৌন হয়রানীর ঘটনা ঘটেনি। বেশিরভাগ ঘটনাই ঘটেছে সহশিক্ষায় শিক্ষা নিতে যাওয়া অর্ধনগ্ন মেয়েদের বেলায়। আর বাকি প্রায় সবগুলোই ঘটেছে তথাকথিত প্রগতি (আসলে দূর্গতি)-বাদীদের দৃষ্টিতে সভ্যতার আলোক (আসলে অসভ্যতার অন্ধকার)-প্রাপ্ত নারীদের বেলায়। আজ পর্যন্ত কোন পর্দাশীল মহিলা কোথাও ইভটিজিং ধর্ষণের স্বীকার হয়েছে বলে আমি জানি না। এমনকি

কোথাও লাঞ্চিত-অপমানিত হওয়ার ঘটনাও আজ অবধি শুনিনি। কারণ, কোন অর্ধনগ্ন মেয়ের প্রতি কোন যুবক সুদৃষ্টিতে তাকায় না। বরং তার দিকে অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকে যৌনকামনা চরিতার্থের আস্থানে। লুলোপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে চেখে নেয় তার সারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। আর অমনি যুবকের মুখ থেকে তার অজান্তেই বেরিয়ে আসে, *হায় সুন্দরী!* ইত্যাদি অশ্লীল ও কদর্য বাক্য।

অপরদিকে একজন পর্দাশীল মহিলার দিকে কোন যুবক অশোভনীয় দৃষ্টিতে তাকায় না। লুলোপ দৃষ্টিতে তাকানোর সাহস পায় না। বরং পর্দাশীল মহিলার দিকে দৃষ্টি পড়তেই অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে বেরিয়ে আসে শ্রদ্ধাবোধ। মায়ের তুল্য মনে হয় তাকে। আর তাইতো বাসে উঠে দেখি, কত যুবক নিজের সিটে মায়ের মতো শ্রদ্ধাবোধে বসিয়ে দিতে বোরকা পরিহিতা মহিলাটিকে। অথচ পাশে দাঁড়িয়ে থাকা অর্ধোলঙ্গ মেয়েটির প্রতি কত কটুজিহ্বা না সে ছুঁড়ে চলেছে।

হ্যাঁ, এটাইতো প্রাকৃতিক নিয়ম। খোলা জিনিসকে লোকে কদর করে কম। সে দিন বাজারে গেলাম চাপাতা কিনতে। দোকানী আমার হাতে একটা চাপাতার প্যাকেট দিয়ে বলল, *এটা ৪০ টাকা। আর খোলাটা ২২ টাকা।* শুনেতো আমি অবাক! পরে বুঝলাম, যে এটাই নিয়ম। খোলা জিনিসের দাম কমই থাকে।

এক গার্লস স্কুলের ছাত্রীদের মাঝে বিতর্ক চলছিল পর্দা নিয়ে। এমন সময় ক্লাসে প্রবেশ করল দীন বিষয়ক শিক্ষিকা, সবাই তার কাছে সমাধান জানতে চাইল। শিক্ষিকা বলল, “ইনশাআল্লাহ আগামিকাল উত্তর পাবে।” পরদিন শিক্ষিকা ক্লাসে আসলো কিছু চকলেট নিয়ে। যার মধ্যে কিছু চকলেট প্যাকেটে আবৃত আর কিছু চকলেট খোলা। অতঃপর শিক্ষিকা সবাইকে তাদের নিজ রুচি অনুযায়ী চকলেট নিতে বলল। সবাই প্যাকেট ওয়ালা চকলেট নিল। আর প্যাকেটহীন চকলেটগুলো টেবিলের উপর পড়ে রইল। এবার শিক্ষিকা প্রশ্ন করল, *আচ্ছা, তোমরা প্যাকেটহীন খোলা চকলেটগুলো কেন নিলে না?* প্রায় সবাই একবাক্যে বলল, কারণ খোলাগুলোতে জীবাণু থাকতে পারে, তাই। শিক্ষিকা বলল, *এটাই হলো তোমাদের কালকের প্রশ্নের উত্তর। পর্দাহীন অর্ধনগ্ন-খোলামেলা কোন*

মহিলাকেও জীবাণুর ভয়ে কোন রুচিবান পুরুষ পছন্দ করেনা।

যে জিনিস যত দামী তার সংরক্ষণের ব্যবস্থাও করা হয় তত সূক্ষ্মভাবে। স্বর্ণালঙ্কার দামী বলেই তা সিন্দুকে ভরে রাখা হয়। জমি-জমার দলিলপত্র দামী বলেই তা সবার অগোচরে রাখা হয়। দামী বলেই চেক বইটা গোপন রাখা হয়। ঠিক তেমনি মেয়েরা মূল্যহীন বলে নয়; তারাই জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ তাই ইসলাম নারীকে কামুকদৃষ্টির অন্তরালে থাকতে বলে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, *মেয়ে লোকের গোটা দেহটাই লজ্জাস্থান। সে যখন বের হয়, শয়তান তখন তাকে পুরুষের দৃষ্টিতে সুশোভন করে তোলে। সে আল্লাহর নিকটবর্তী থাকে তখন, যখন সে তার নিজ বাড়িতে থাকে।* (সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ১১৭৩)

মেয়ে লোকের সারা দেহটাই মোহনীয়, তাই সে মোহিনী। তার সারা দেহটাই কমনীয়, তাই সে কামিনী। তার সারা দেহটাই রমণীয় তাই সে রমণী। তাকে দেখে পুরুষ লালায়িত হয়, তাই সে ললনা। যখন সে সামনের দিকে আসে, পুরুষ তার চেহারা ও বক্ষঃস্থলের প্রতি সকাম দৃষ্টি রাখে। তার দেহ নিয়ে পাড়ি জমায় কল্পনার জগতে। বাস্তবে পেতে কামনা করে। কাছে পেলে ইভটিজিং করে। কেউ বলে, *বেল পাকলে কাকের কী?* স্বামীর সাথে অর্ধোলঙ্গ স্ত্রীকে দেখে বলে, *দেখছ কী ফ্যাল ফ্যাল, যার সরষে তার তেল!* সুন্দরীকে অসুন্দর স্বামীর সাথে দেখে বলে, *কাকের ঠোটে পাকা আঙ্গুর! বা পাকা আম দাঁড়কাকে খায়!* ইত্যাদি কদর্য বাক্য। চোরের হাত থেকে মূল্যবান গহনা রক্ষার জন্য যেমন তা সিন্দুকে গোপন রাখা হয়, তেমনি নারীকে এসব ইভটিজারদের হাত থেকে রক্ষার জন্যই মহান রবের বিধান পর্দা।

পর্দাশীলতা ও পর্দাহীনতার পার্থক্য

পর্দাশীলতা- আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য।

পর্দাহীনতা- আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য।

পর্দাশীলতা- নারীর নারীত্ব, সতীর সতীত্ব ও সম্ভ্রম রক্ষার গ্যারান্টি।

পর্দাহীনতা- নারীর নারীত্ব, সতীত্ব ও সম্ভ্রম হারানোর মূল কারণ।

পর্দাশীলতা- নারীর মান-মর্যাদা রক্ষার হাতিয়ার।

পর্দাহীনতা- নারীর যত্রতত্র লাক্ষিত-অপমানিত হওয়ার মূল কারণ।

পর্দাশীলতা- সংসারে বয়ে আনে অনাবিল সুখ।

পর্দাহীনতা- দাম্পত্যজীবনে অশান্তির অন্যতম কারণ।

পর্দাশীলতা- জাহান্নামের আগুন থেকে পর্দা।

পর্দাহীনতা- মেয়েদের জাহান্নামী হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ।

পর্দাশীলতা- সভ্য মহিলার ভূষণ।

পর্দাহীনতা- কিয়ামতের আলামত।

প্রিয় বোনটি আমার, একটু বুঝার চেষ্টা করো। পর্দা তোমাকে অবরুদ্ধ করে রাখার জন্য নয়। রাস্তায় পড়ে থাকা ভাঙ্গা কাঁচ কি কেউ তোলে নিয়ে সিন্দুকে ভরে রাখে? অবশ্যই না। কিন্তু কাঞ্চন বা মুক্তা? হ্যাঁ, তুমিতো ভাঙ্গা কাঁচ নও; তুমি হলে কাঞ্চন বা মুক্তা সদৃশ। তাই তোমার সৃষ্টিকর্তা মহাবিজ্ঞানী আল্লাহ (সুব.) তোমাকে পর্দার বিধান দিয়েছেন। তুমি কেন তা প্রত্যাখ্যান করছ? কেন নিজেকেই ধোকা দিয়ে চলছ? তুমিতো তোমার ইহ-পর উভয় কালই ধ্বংস করছো। একটু ভেবে দেখো বোন, তুমি কিসের নেশায়, কোথায়, কার পিছে ছুটছো? সে তোমায় ধোকা দেবে নাতো?

ফিরে এসো জীবনের প্রকৃত সুখদ কাননে

আল্লাহ (সুবহানাহু তায়ালা) শেষ নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে এমন একসময় এমন এক সমাজে ইসলাম নামক জীবনব্যবস্থা দিয়ে প্রেরণ করেছিলেন, যে সময় নারী ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে সস্তা পণ্য। মানুষ হিসেবে বেচে থাকার অধিকারটুকু পর্যন্ত ছিল না তার। নারীর ছিল না কোন মান-মর্যাদা। যৌনসম্বোধের বস্তু হিসেবে নারীর সস্তা বাজার ছিল রমরমা। (যা বর্তমানেও পতিতাবৃত্তি নামে এই কুফরী সমাজে প্রচলিত রয়েছে। রাষ্ট্রীয়ভাবেও যাকে হালাল বলে ঘোষণা করা হয়েছে)

ইসলাম এমন এক মুহুর্তে আগমন করেছিল, যখন জায়া-জননী এমনকি কন্যা হিসেবেও নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত ছিল না। তাইতো সে সমাজের মানবরূপী পশুরা কন্যাসন্তান জন্ম নিলে ভ্রুকুণ্ঠিত করতো। মুখ-

মন্ডল কালো বিবর্ণ হয়ে যেত। কুরআনে তাদের এ কুকীর্তি বর্ণিত হয়েছে এভাবে, আর যখন তাদেরকে কন্যাসন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয়, তখন তাদের মুখমন্ডল কালো বিবর্ণ হয়ে যায়। আর সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। তাকে যে সংবাদ দেওয়া হয়। তার গ্লানি হেতু সে নিজ সম্প্রদায় হতে আত্মগোপন করে। সে ভাবে, হীনতা সত্ত্বেও তাকে রেখে দেবে, না মাটিতে পুঁতে ফেলবে। সাবধান! তারা যা সিদ্ধান্ত করে, তা কতই না নিকৃষ্ট। (সূরা নাহল: ৮৮-৮৯)

এমনকি কন্যাসন্তানকে মাটিতে জীবন্ত পুঁতে ফেলতে পর্যন্ত কুষ্ঠাবোধ করত না। মহান রব আমাদের তা জানিয়ে দিয়েছেন এবং এহেন পাপের জন্য কঠোর জবাবদিহীর ধমকি দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন, যখন জীবন্তপ্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল? (সূরা তাকভীর: ৮-৯) (বর্তমান নব্য জাহেলি সমাজব্যবস্থায়ও কন্যাসন্তান হত্যা করা হচ্ছে। প্রযুক্তির ছোঁয়ায় সেটার ধরনটা ভিন্ন হয়েছে মাত্র। 4D কালার ডপলারের মাধ্যমে কন্যাদ্রুণ চিহ্নিত করে গর্ভেই তাকে হত্যা করা হচ্ছে) সে যুগে কন্যাসন্তানের জন্য মিরাস (বাবা অথবা মায়ের ত্যাজ্য সম্পত্তি)-এর কোন অংশ ছিল না। (বর্তমান জাহেলী সমাজব্যবস্থায়ও মিরাসে কন্যার কোন অংশ নেই। যা পন বা যৌতুক প্রথার একটি অন্যতম প্রধান কারণ)

কিন্তু ইসলাম এসে নারীকে ফিরিয়ে দিলো তার পূর্ণ অধিকার। অজ্ঞতার সিন্ধু থেকে তোলে এনে স্নাত করাল তাওহীদের স্বচ্ছ ফোয়ারায়। ইসলামের অনুপম ছোঁয়ায় নারী ফিরে পেল তার ন্যায্য পাওনা। জায়া-জননী-কন্যারূপে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করল নারীকে। ইসলাম শিখাল, নারী কেবল ভোগ্যপণ্য নয়; নারী স্ত্রী, নারী মা, নারী কন্যা। তাইতো বিশ্বনাবী (সা.) ঘোষণা দিলেন, হে আল্লাহ! আমি দুই দুর্বল তথা ইয়াতীম ও নারীর অধিকার লজ্জনে অপরাধের কথা ঘোষণা করছি। (সিলসিলা সহীহাহ, হাদীস নং ১০১৫)

তিনি বজ্রকণ্ঠে আরও ঘোষণা দিলেন, যে ব্যক্তি একাধিক কন্যাসন্তান নিয়ে সঙ্কটাপন্ন হবে, অতঃপর সে তাদের প্রতি যথার্থ সদ্যহার করবে, সেই ব্যক্তির জন্য ঐ কন্যাসন্তানরা জাহান্নাম থেকে মুক্তির কারণ হবে। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৪১৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬২৯)

প্রিয় বোন তুমি কি এখনো বুঝনি পর্দার মহাত্ম্য? এখনো কেন ঘুরে

বেড়াচ্ছে। নগ্নসভ্যতার গহিন বনে। এখনো কি ফেরার সময় হয়নি? এখনো কি বুঝে নেওয়ার সময় হয়নি তোমার প্রাপ্য অধিকার? ফিরে এসো বোন। ঐ চেয়ে দেখ, জান্নাতি সুরা হাতে সাকীরা তোমায় আহ্বান করছে। ঐ কান পেতে শোন, খাদিজা, আয়িশা, সাফিয়া, সাদিয়া, ফাতিমা, যায়নাবের উত্তরসূরীরা তোমায় আহ্বান করছে জীবনের প্রকৃত সুখদ কানন পর্দার সুশীতল পরিবেশে।

একমাত্র ইসলামই দিয়েছে তোমায় পূর্ণ অধিকার

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তোমার পবিত্র জীবনটাকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথাঃ ১. শিশু-কিশোর কাল। ২. যৌবনকাল। ৩. বৃদ্ধকাল। আর এ তিনকালেই ইসলাম তোমাকে দিয়েছে পূর্ণ অধিকার। যা অন্যকোন সমাজব্যবস্থা দিতে পারেনি বা দিতে সচেষ্টও হয়নি। ফলে তোমার মতো আমার একদল বোন আজ সম্ভ্রম হারানোর বেদনায় নীল হয়ে ঢুকরে কাঁদছে নিরবধি। তাদের জন্যই আমার এই উদাত্ত আহ্বান।

তোমার জীবনের প্রথম ধাপটি হলো- শিশু-কিশোর কাল। যখন তুমি কারো কন্যা বা বোন। এমতাবস্থায় ইসলাম ঘোষিত তোমার কী অধিকার তুমি কি জানো? ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, বিশ্বনেতা মুহাম্মাদ (সা.) বলেছেন, কেউ যদি তিনটি কন্যাসন্তান অথবা বোন (বিয়ের আগ পর্যন্ত) লালন পালন করে, তাদেরকে উত্তম আচরণ শিক্ষা দেয় ও তাদের প্রতি দয়া করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে দেন। একজন প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যদি দু'জন (মেয়ে অথবা বোন) হয়? রাসূল (সা.) বললেন, হ্যাঁ, দু'জন হলেও। এমনকি একজন হলেও। (মিশকাতুল মাসাবীহ, ৪২৩ পৃষ্ঠা)

জাহেলী এবং আধুনিক নব্য জাহেলী সমাজব্যবস্থায় যেখানে নারীকে কন্যার অধিকারটুকু পর্যন্ত দেওয়া হয় না, সেখানে আল্লাহ ঘোষিত ইসলামের বিধান কত সুমহান। শুধু সামাজিক দায়বদ্ধতার চাপে পড়ে নয়, বরং একজন পিতা তার আপন কন্যাকে অথবা বড় ভাই তার আপন বোনকে এজন্য প্রতিপালন করবে যে, সে এই কাজের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি তথা জান্নাত লাভ করবে।

অতঃপর তোমার জীবনের দ্বিতীয় ধাপটি হলো- যৌবনকাল। যখন তুমি কারো জায়া বা স্ত্রী। পাশ্চাত্যের ভোগবাদী সমাজব্যবস্থায় লিভ টু গোদার নামক কুসংস্কৃতির ফলে সেখানে স্ত্রী হিসেবে নারীর কোন অধিকার নেই। আপন স্বামীকে কথিত গার্ডফ্রেন্ডের সাথে রাতযাপন করতে দেখেও সলজ্জ চাহনি ছাড়া স্ত্রীর অধিকার নেই কিছুই বলার। একটি সমাজের মূল অবকাঠামো হলো পরিবার। আর একটি পরিবারের প্রাণশক্তি হলো স্বামী-স্ত্রীর সৌহার্দপূর্ণ অটুট বন্ধন। তাইতো কোন এক সমাজবিজ্ঞানী বলেছিলেন, “একজন আদর্শ মা-ই পারে উপহার দিতে একটি আদর্শ জাতি।” এমতাবস্থায় স্বামীর কাছ থেকে প্রাপ্য তোমার অধিকার সম্পর্কে ইসলাম ঘোষণা করছে—

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, বিশ্বনেতা মুহাম্মাদ (সা.) বলেন, পূর্ণ ঈমানদার ঐ ব্যক্তি, যার চরিত্র উত্তম। আর নিশ্চয় চরিত্র উত্তম ঐ ব্যক্তির, যার নিজ স্ত্রীর নিকট সে উত্তম। (তিরমিযী, হাদীস নং ১১৬২; মিশকাত: ২৮২ পৃঃ)

বিয়ের পর থেকে তোমার ভরণ-পোষণসহ সার্বিক দিক তোমার স্বামী দেখা-শোনা করবে কেবল সামাজিক দায়বদ্ধতার চাপে পড়ে নয়; বরং পরিপূর্ণ ঈমানদার হওয়ার জন্য। হ্যাঁ, বিশ্বমানবতার মুক্তিদূত মুহাম্মাদ (সা.) ঘোষিত এটাই তোমার অধিকার। শুধু তাই নয়; ইহকালীন জীবনে পূর্ণ অধিকার ভোগ করা সত্ত্বেও পরকালীন জীবনে অতি সহজেই তুমি পাবে চির সুখের কানন জান্নাত। বিশ্বনাবী (সা.) বলেন—

কোন মহিলা যদি নিয়মিত পাঁচওয়াক্ত সালাত আদায় করে, রমযান মাসে সিয়াম পালন করে, পর্দা মেনে চলে ও তার স্বামীর (ন্যায়সঙ্গত) আনুগত্য করে, সে মহিলা তার ইচ্ছানুযায়ী যেকোন দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। (মিশকাত: ২৮১ পৃঃ)

এইতো জীবনের সফলতা! হ্যাঁ, চেয়ে দেখ, সফলতা তোমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে। তবুও তুমি কোথায় ফিরছো? যাদের জীবনকে তুমি আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছো, নারী স্বাধীনতার নামে জরায়ু স্বাধীনতাকামী যে সকল আলোকপ্রাপ্তা প্রগতিবাদীদের পিছনে তুমি অক্লান্ত হাঁটছো একটি বার হলেও তাদের প্রশ্ন করে দেখ, পারিবারিক জীবনে তারা কতটা সুখী?

মাউন্ট এভারেস্ট বিজয়ে তোমার কোন কৃতিত্ব নেই। ওটা তোমার কাজও নয়। গার্মেন্টসে অধিক পরিশ্রমের অল্প বেতনে চাকরি করে পরিবার প্রতিপালন তোমার কাজ নয়। রাস্তায় মাটি কাটা বা ইট ভাঙ্গাও তোমার কাজ নয়। তোমার কাজ হলো— পর্দার বেষ্টনীতে অবস্থানপূর্বক সালাত আদায় করা, সিয়াম পালন করা, স্বামীর আনুগত্য করা ও স্বামীর উপার্জিত অর্থে সন্তানগুলো প্রতিপালন করা। তাদেরকে কিতাল ফী সাবীলিল্লাহর জন্য মর্দে মুজাহিদ হিসেবে গড়ে তোলা। হ্যাঁ, এটাই তোমার কাজ, এতেই তোমার কৃতিত্ব। তোমাকে তোমার রব এ কাজের জন্যই উপযুক্ত করে সৃষ্টি করেছেন। জানিনা তোমার আসল দায়িত্বটুকু বুঝাতে পেরেছি কিনা। তবে ছোট্ট একটা উদাহরণের মাধ্যমে তোমাকে বিষয়টি আরো স্পষ্ট করে বলতে চাই—

মালবাহী বোঝাই ট্রাক দেখেছ নিশ্চয়; যার পুরোটা ভার বহন করে প্লাস্টিক বা লেদারের তৈরি চাকা দু'টো। কিন্তু সেই চাকাও চলতে অক্ষম ভিতরে যদি টিউব না থাকে। বুঝতেই পারছো তাহলে টিউবের মূল্য কত? কিন্তু টিউব যদি বলে বসে, চাকার ভিতরে অন্ধকার প্রকোষ্ঠে অন্ধত্বের গ্লানি আর সইতে পারছি না। তাই থাকবো নাকো বন্ধ ঘরে, দেখব এবার জগৎটারে। তাহলে পরিস্থিতি কী দাঁড়াবে? অথবা ট্রেন যদি বলে, পাথরের ঝনঝন শব্দ আর ভাঙা পিচালা রাস্তায় চলার অধিকার দিতে হবে। তাহলে কি সুস্থ্য বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি তাই করবেন? কক্ষনো নয়। কেননা ট্রেন তৈরিই হয়েছে এই প্রকৃতিতে যে, লোহার তৈরি লাইনে ঝন ঝনা ঝন ছন্দ তোলে তালে তালে তাকে চলতে হবে। ঠিক তেমনি, তোমাকে তোমার সৃষ্টিকর্তা এই প্রকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন যে, তুমি পর্দার বেষ্টনীতে অবস্থানপূর্বক নেতৃত্ব দিবে সুস্থ-সুন্দর একটি জাতি গঠনে। বিশ্বমানবতার মুক্তিদূত মুহাম্মাদ (সা.) বলেন, একজন নারী আল্লাহর নিকটবর্তী থাকে তখন, যখন সে তার নিজ গৃহে অবস্থান করে। (তিরমিযী, হাদীস নং ১১৭৩)

ইসলাম তোমাকে অবরুদ্ধ করে রাখতে চায় না। বরং তোমার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চায় মাত্র। কারণ, তুমি যে জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

ব্যক্তিগত কাজে বাইরে বের হওয়ার অধিকার ইসলাম তোমাকে প্রদান করে। কিন্তু বাইরে বের হওয়ার সময় জাহেলী যুগের সেকেন্দা-অসভ্য মহিলাদের মতো নগ্ন-অর্ধনগ্ন হয়ে নয়; বরং সোনালী যুগের সভ্য-ভদ্র মহিলাদের মতো পর্দার সাথে বের হতে বলে। আল্লাহ (সুব.) বলেন,

(হে নারীগণ) তোমরা নিজেদের গৃহে অবস্থান করবে এবং (প্রয়োজনে কোথাও বের হওয়ার সময়) অসভ্য যুগের নারীদের মতো নিজেদের প্রদর্শন করবে না। (সূরা আহযাব: ৩৩)

অতঃপর তোমার জীবনের তৃতীয় ধাপটি হলো— বৃদ্ধকাল। যখন তুমি কারো জননী বা মা। পশ্চিমা বস্তুবাদী সভ্যতায় মা হিসেবে নারীর কোন অধিকার নেই। যতদিন কাজ-কর্ম, চাকরি-বাকরি করে খেতে পারবে ততদিন সমাজে বসবাসের অধিকার রয়েছে। কিন্তু যখন বয়সের ভারে কাজের সক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, তখন গর্ভধারিণী মায়ের আশ্রয়স্থল হয় বৃদ্ধখোঁয়াড় বা বৃদ্ধাশ্রম! অথচ আল্লাহপ্রদত্ত জীবনব্যবস্থা ইসলাম মা হিসেবে নারীর পূর্ণ অধিকার ঘোষণা করেছে। আল্লাহ (সুব.) ইরশাদ করেন—

তোমার রব আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদাত করবে না। পিতা মাতার প্রতি সদ্যবহার করবে। তাঁদের একজন অথবা উভয়ই তোমার জীবদ্দশায় বার্ষিক্যে উপনীত হলে তাঁদেরকে উফ (বিরক্তি, উপেক্ষা, অবজ্ঞা, ক্রোধ ও ঘৃণাসূচক কথা) বলবে না এবং তাদেরকে ধমক দিবে না। তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বলবে। তাঁদের প্রতি মমতার ডানা অবনমিত রাখবে এবং রবের কাছে বলবে, হে আমার রব! তুমি তাঁদের প্রতি দয়া কর, যেভাবে শৈশবে তারা আমার প্রতি দয়া করেছেন। (বানী ইসরাঈল: ২৩-২৪)

যেহেতু আল্লাহ (সুব.) নির্দেশ দিয়েছেন সন্তানের প্রতি, তাই সন্তানের জন্য এটা ফরয। এমনকি পিতা-মাতার সাথে বিরক্তি বা ধমকের স্বরে কথা বলাও নিষেধ। পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ ও সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধান-পরিচর্যার মাধ্যমে সে তাঁদের সন্তুষ্টি কামনা করবে। কারণ রাসূল (সা.) বলেন,

পিতা-মাতার সন্তুষ্টি আল্লাহর সন্তুষ্টি; পিতা-মাতার অসন্তুষ্টিই আল্লাহর অসন্তুষ্টি। (তিরমিযী: ১৮৯৯)

অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টির পূর্বশর্ত হচ্ছে পিতা-মাতার সন্তুষ্টি। আল্লাহ যাঁর প্রতি সন্তুষ্টি তার জন্য দুনিয়াতে রয়েছে কল্যাণ; আর আখিরাতে জান্নাত। বিষয়টি আরো সহজভাবে বুঝাতে গিয়ে রাসূল (সা.) বলেন, *মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের জান্নাত।* (আহমাদ, নাসাঈ, বাইহাকী, মিশকাত: ৪২১ পৃ.)

নারীকে এমন অধিকার ইসলাম কখন দিয়েছিল জানোতো? হ্যাঁ, এমন এক সময়, যখন আসমানের নিচে যমীনের উপরে সবচেয়ে নিপীড়িত প্রাণী ছিল নারী। কন্যা-জায়া-জননী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল না নারীর কোনো অধিকার। একদিন বিশ্ব মানবতার মুক্তিদূত, রাহমাতুল্লিল আলামীন নাবী মুহাম্মাদ (সা.)-এর বৈঠকে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, *ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার কাছ থেকে ভাল ব্যবহার পাওয়ার প্রথম হকদার কে?* রাসূল (সা.) বললেন, *তোমার মা।* লোকটি বলল, *তারপর কে?* রাসূল (সা.) বললেন, *তোমার মা।* লোকটি আবার বলল, *তারপর কে?* রাসূল এবারও বললেন, *তোমার মা।* অতঃপর লোকটি আগ্রহান্বিত হয়ে আবারও প্রশ্ন করল, *ইয়া রাসূলুল্লাহ! তারপর কে?* এবার বিশ্বনাবী (সা.) বললেন, *তোমার বাবা।* (সহীহ বুখারী: ৫৯৭১; সহীহ মুসলিম: ৬৩১৮)

প্রিয় বোনটি আমার! একটু খুঁজেই দেখ না, পৃথিবীর অন্যকোন জীবনব্যবস্থায় নারীর এমন অধিকার আছে কিনা? না, আমি শতভাগ নিশ্চিত তুমি পাবে না। পৃথিবীর বৃকে ইসলাম ব্যতীত অন্যকোন তন্ত্র-মন্ত্র-ইজম নারীর পূর্ণ অধিকার স্বীকার করে না। তারা চায় সমান অধিকার। আর ইসলাম নারীকে দেয় পুরুষের চেয়ে তিনগুণ অগ্রাধিকার। সমান মানে বুঝতো? নারী পুরুষের কর্মক্ষেত্রও নাকি সমান। অর্থাৎ পুরুষ রিক্সা চালায়, তোমাকেও রিক্সা চালাতে হবে। তবেই না হবে সমান অধিকার!

কিন্তু তোমাকে মনে রাখতে হবে, পুরুষ আর নারীর কর্মক্ষেত্র এক নয়। ওরা তোমাকে সমান অধিকারের বুলি শোনায়ে; কিন্তু ইসলাম তোমাকে দেয় পুরুষের চেয়ে তিনগুণ অগ্রাধিকার। তোমার স্বামী সারাদিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যা উপার্জন করবে, তুমি ঘরে থেকেও সেই উপার্জিত অর্থের পূর্ণ হকদার। সেখান থেকে এক চিম্টি পরিমাণও ঠকাবার অধিকার তোমার স্বামীর নেই। যদি ঠকায় তবে অবশ্যই তাকে

জবাবদিহী করতে হবে আল্লাহর দরবারে। নারী-পুরুষের কর্মক্ষেত্র যে আলাদা তা ইতিপূর্বেই কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণ করেছি। মুসলিম হিসেবে তোমার অবশ্যই কর্তব্য হবে তা অকুণ্ঠচিত্তে মেনে নেওয়া। এর পরও ছোট একটি ঘটনার মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট করে তোলতে চাই—

পাহাড়ের পাদদেশে বাস করতো এক নব দম্পত্তি। স্বামী-স্ত্রী আর ফুটফুটে একটা সোনামণি; এ-ই মিলে একটা অপূর্ণ পরিবার। কথা ছিল পরিবারটি হবে সুখের উদ্যান। কিন্তু না, একটা এনজিও-র কল্যাণে (?) প্রগতির হাওয়া লেগেছিল তাদের গায়। আর সে হাওয়ায় তুলোর মতো উড়ে গিয়েছিল সুখগুলো। উড়ে এসে পরিবার জুড়ে গেড়ে বসেছিল দুখের কালো ছায়া। কলহ-বিবাদ লেগেই থাকতো সর্বদা। সকাল-বিকাল ঝগড়া যেন রুটিন করা। এদের অত্যাচারে পুরো গ্রামবাসী একেবারেই অতিষ্ঠ। সবারই চিন্তা, এর একটা সুরাহা প্রয়োজন।

তাই গ্রামবাসী মাতাম্বরদের দিয়ে সালিশ বসালো। স্বামীর অভিযোগ—*ও (স্ত্রী) সারাদিন ঘরে বসে বসে কুটকুট করে। খাওয়া-দাওয়া ছাড়া আর কোন কাজই নাই তার।* অপরদিকে স্ত্রীর অভিযোগের ধরনও একই—*ও (স্বামী) সারাদিন মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়ায়, আর আমাকে আটকে রাখে ঘরের ভিতর। দু'জনই মাতাম্বরদের কাছে আবেদন জানায় কর্মক্ষেত্র পাণ্টে দেবার।* অর্থাৎ স্বামী করবে ঘরের কাজ আর স্ত্রী করবে মাঠের কাজ! সমাজপতিরাও ওদের একটা উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার মোক্ষম সুযোগ পেয়ে গেলেন। বদল করে দিলেন কর্মক্ষেত্র।

অতঃপর যা ঘটল, তা ছিল একেবারেই অনাকাঙ্ক্ষিত। ঘুম থেকে উঠে সাজ সকালে স্বামী ঢুকল রান্না ঘরে আর লাঙ্গল কাঁধে ফেলে গরুগুলো হাঁকাতে হাঁকাতে স্ত্রী ছুটল মাঠে। নতুন কর্মক্ষেত্রে নিয়োগ। দূর্ঘটনা ঘটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এতটা হয়তো কেউ কোনদিন কল্পনাও করতে পারেনি। চুলোয় ভাত চড়াল স্বামী। ভাতও প্রায় হয়ে এসেছে। এমন সময় বাড়িতে ঢুকল একপাল গরু। গরু তাড়াতে গিয়ে চুলোয় ভাতের কথা ভুলে গেল। কিছুক্ষণ পর রান্না ঘর থেকে ধোঁয়ার সাথে ভেসে এলো পুড়া গন্ধ। মনে

পড়ল ভাতের কথা। দৌড়ে গিয়ে ভাত নামাতে যেয়ে গরম ডেগে পুড়ে বসল হাত। রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে হাতের যন্ত্রণা নিয়ে খাটের উপর দিলো চিৎপটাং। অপরদিকে স্ত্রীর অবস্থাতো আরো করুণ।

লাঙ্গল আর গরুগুলো নিয়ে মানুষের শত বিদুপ উপেক্ষা করে কোন রকম গিয়ে পৌঁছল হালের জমিতে। বেলা তখন প্রায় সাড়ে দশটা। যেই-না গরুর গলায় জোয়াল বাঁধতে গেল, অমনি গরু দুইটা দুই দিকে দিলো ভাঁ দৌড়। দুই দিকেতো আর যাওয়া সম্ভব না; তাই ছোটটার আশা ছেড়ে দিয়ে সেও ছুটলো বড় গরুটার পেছন পেছন। মেয়ে মানুষ বলে কথা! কতক্ষণ আর দৌড়াতে পারে। মিনিট দু'য়েক দৌড়িয়েই হাঁপিয়ে উঠল। অতঃপর গরুর হাল ছেড়ে লাঙ্গল কাঁধে ফেলে হাঁপাতে হাঁপাতে গিয়ে পৌঁছল বাড়ি পর্যন্ত। রাগে-ক্ষোভে অগ্নিশর্মা হয়ে খাটের একপাশে সেও দিলো চিৎপটাং। এভাবেই সময় কেটে গেল সন্ধ্যা পর্যন্ত। দুজনই বুঝতে পারলো যে, নারী-পুরুষের কর্মক্ষেত্র এক নয়।

তো যাইহোক, তোমাকে যা বুঝাতে চাচ্ছি তা হলো, অধিকার আর কর্মক্ষেত্র বিষয় দু'টি এক নয়। অধিকার তোমাকে পুরুষের চেয়ে তিনগুণ বেশি দিয়েছে ইসলাম। কিন্তু কর্মক্ষেত্র নির্ধারণের বেলায় তোমাকে দেওয়া হয়েছে ইনপুট আর পুরুষকে দেওয়া হয়েছে আউটপুট। কিন্তু তুমি ইনপুট (ঘর)-টাকে মনে করছ জেলখানা। আচ্ছা, জেলখানায় কারা থাকে? চোর-গুন্ডা-বদমাইশ অর্থাৎ অপরাধীরা তাইতো? কিন্তু আমি তো জানি, জেলখানায় পুলিশও থাকে, আসল কথা হচ্ছে, অপরাধীরা জেলখানায় থাকে অধিকারহীন, নিরুপায়, বঞ্চিত হয়ে। আর পুলিশ থাকে পূর্ণ অধিকারসহ। ঘরটাকে যদি তুমি জেলখানাই মনে কর, তাহলে সেই ছোট জেলখানায় তুমি হলে এস.পি। আসামী কি প্রয়োজন হলেই বাইরে যেতে পারে? অবশ্যই না। কিন্তু ইসলামতো তোমাকে প্রয়োজনে বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেয়। তবে শুধু বলে, অসভ্য মহিলাদের মতো নগ্ন-অর্ধনগ্ন হয়ে নয়; বরং সভ্য মহিলার মতো পর্দা করে বের হতে। মোটকথা: ইসলাম তোমাকে দিয়েছে সর্বক্ষেত্রে অধাধিকার; সমান নয়। এতক্ষণ তোমাকে যা বুঝাতে চেয়েছি, জানিনা বুঝাতে পেরেছি কি না, ব্যাপারটা একেবারেই

সহজ। একটু চেষ্টা করে বুঝে নিলেই হলো। কারণ—

একটু ভেবে দেখো বোন, তোমার এই উথাল-পাথাল যৌবনঝড় অবশ্যই একদিন নিস্তব্ধ হয়ে যাবে। থেমে যাবে যৌবনের মিথ্যে যত উচ্ছ্বাস। আজকের এই উত্তপ্ত রক্ত কণিকাগুলো একদিন নিরুত্তাপ শীতল হয়ে যাবে। এই টান টান ত্বক একদিন ঢিলে হয়ে যাবে। যে চক্ষু দিয়ে নয়রবান মেরে আজ শত যুবককে বিপথগামী করছো, তাও একদিন গর্তে ঢুকে যাবে। তোমার দিকে তখন আর কেউ অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকবে না। কেউ তোমাকে নিয়ে পাড়ি জমাবে না স্বপ্নের জগতে। কেউ ইভটিজিং-র্যাগিং-উত্যক্ত করবে না তোমাকে। তোমার দিকে সকাম দৃষ্টিপাত করবে না কেউ। তোমার চলনে-বলনে কেউ তখন আর স্পন্দিত হবে না, আলোড়িত হবে না কারো হৃদয়তন্ত্রী। তাহলে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, যুগের ভ্রষ্ট আরিফদের চাহিদা কেবল তোমার যৌবন। তাই এই যৌবনকালের গুরুত্ব অপরিসীম। এক হাদীসে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, *দেটি প্রশ্নের উত্তর প্রদান ব্যতীত কিয়ামতের ময়দান থেকে কোন আদম সন্তান এক কদম সামনে অগ্রসর হতে পারবে না*, যার দ্বিতীয়টি হচ্ছে, *তোমার যৌবনকাল কীভাবে ব্যয় করেছে?* (তিরমিযী, হাদীস নং ২৪১৬)

যৌবনকালই মানুষের জীবনের মূল অধ্যায়। তাই রাস্তার কুকুরদের হাতে মূল্যবান যৌবনটা বিকিয়ে না দিয়ে পরম যতনে রেখে দাও প্রেমাস্পদ স্বামীর জন্য। সব ভুয়া চাকরিক্যের প্রাচীর ডিঙিয়ে সাড়া দাও তোমার প্রভুর আহ্বানে। জীবনের প্রতিটি পরতে মেনে নাও তোমার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ (সুব.)-এর উলুহিয়াত তথা সার্বভৌমত্ব। তবেই তুমি ইহ-পর উভয়কালে লাভ করবে মহা-সফলতা। খুঁজে পাবে জীবনের প্রকৃত অর্থ আর ঈমানের পরম স্বাদ। তাই ছুটে এসো আজ হেরার আলোকোজ্জ্বল দৃষ্টিময় পথটি পানে। ছুটে এসো তাওহীদী খেয়ায়ানে।

ইতি-

তোমার এক সুভাষাঞ্জলি ভাই

৩০/০২/২০১৩ ইং

তৈরি খেয়াযান

মুনীরুল ইসলাম আয-যাকির

সুখের মাকান, রবের বিধান পর্দা-হিজাব ছাড়ি,
উদ্ভ্রান্তের ন্যায় এ কোন্ পথে ছুটিছে আজ নারী।
অসভ্যতা আর অশ্লীলতাই আজকে যেনো ফ্যাশান,
সাজ-পোষাকে যায় না চেনা হিন্দু কিনা মুসলমান।

সমধিকার দাবি করে রাজপথে হরতালে,
ইসলাম দেয় অগ্রাধিকার চায় না সেদিক চোখ মেলে।

রবের দেয়া সভ্যতা আর সংস্কৃতি ফেলে,
পশ্চিমাদের সংস্কৃতি আজ নিয়েছে গিলে।

তাইতো নেমে এসেছে গযব ইভটিজিং আর খুন,
সম্রম হারিয়ে কাঁদছে কত বেপর্দা মা -বোন।
সুখের জীবন আটকে গেছে দুখের বেড়াজালে,
ছুটেছে তবু জাহান্নামের পথেই দলে দলে।

যুগের নাবিক, ভ্রান্তপথিক শোন খুলে প্রাণ,
সিন্দাবাদ ঐ ডাকছে তোমায় তৈরি খেয়াযান।
কুরআন নামক বৈঠা ধর হাদীস নামক পাল,
শক্ত হাতে, বজ্র মাথে ধর খেয়ার হাল।

ইনশাআল্লাহ! শীঘ্রই বাজারে
আসছে
লেখকের গুরুত্বপূর্ণ দু'টি বই-

- ⇒ কুফর বিত-তাগুত: ঈমান বিল্লাহ
- ⇒ তাওহীদের পথে বাধা

প্রাপ্তিস্থান:

আন-নূর লাইব্রেরী

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর মহানগর।

আলাপনী: ০১৯১৯ ১৯৮০৫০।

এ. হাসিব পুস্তকালয়

সুজাপুর, মালদা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

আলাপনী: ০০৯১৯৭৩৩০২৪৬২৫

খান প্রকাশনী

ইসলামী টাওয়ার, বাংলা বাজার, ঢাকা।

আলাপনী: ০১৭৪০ ১৯২৪১১।

ইলমা প্রকাশনী

২০/লুৎফুর রহমান লেন, সুরিটোলা, ঢাকা।

আলাপনী: ০১৯১১ ৪৯৬০২৭।